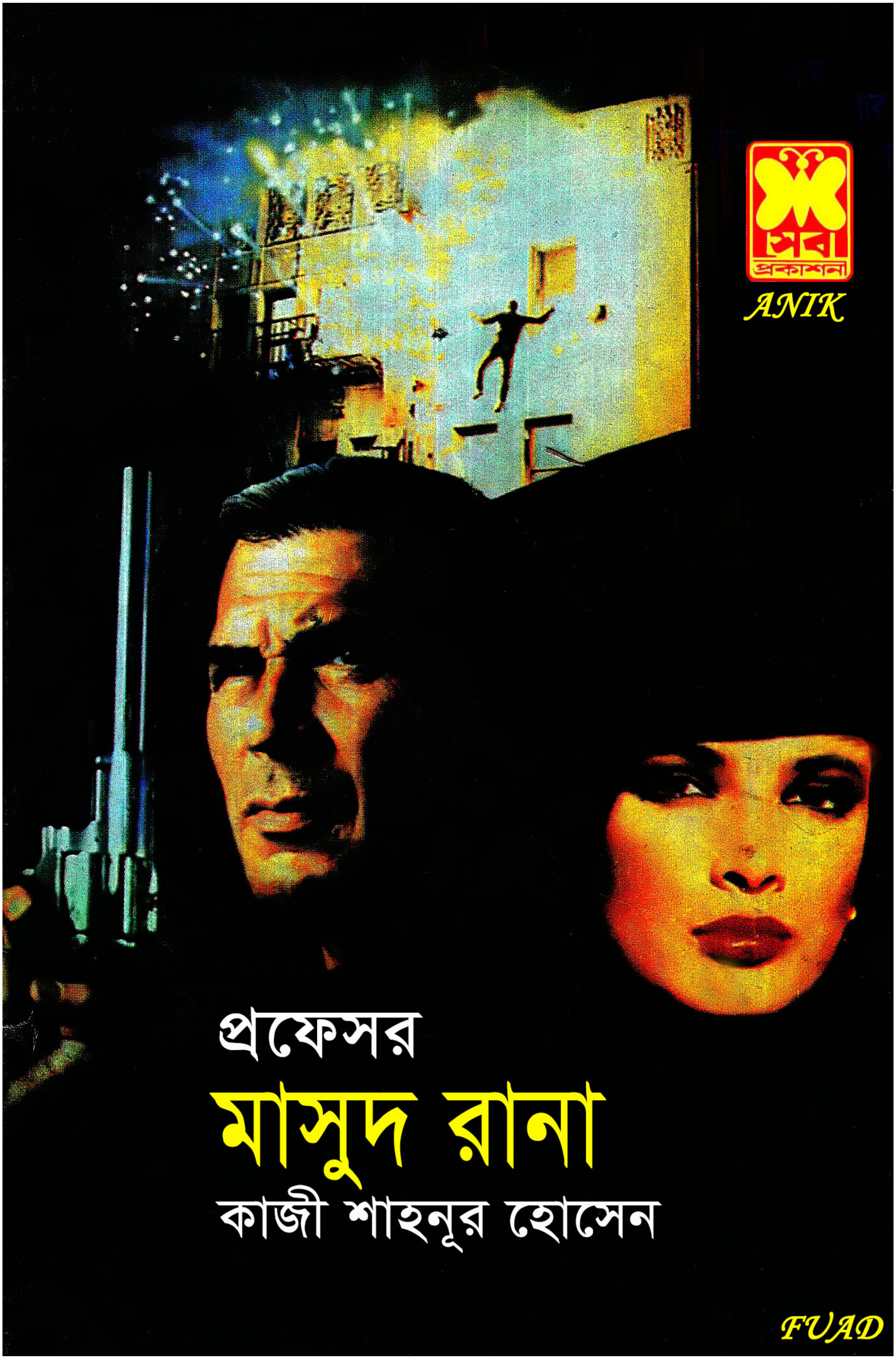

প্রফেসর

মাসুদ রানা

কাজী শাহনূর হোসেন

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

একখণ্ডে সমাপ্ত স্পাই থ্রিলার

প্রফেসর মাসুদ রানা

কাজী শাহনূর হোসেন

সেবা প্রকাশনী

একুশ টাকা

ISBN 984 16 0127 3

প্রকাশকঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশঃ ডিসেম্বর, ১৯৯৩

প্রচ্ছদ পরিকল্পনাঃ রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকরঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানাঃ
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপনঃ ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

শো-রুমঃ
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

PROFESSOR MASUD RANA
By Qazi Shahnoor Husain

প্রফেসর মাসুদ রানা

সেবা
প্রকাশনী

সেবা প্রকাশনীর

আরও ক'টি রোমাঞ্চোপন্যাস

কাজী আনোয়ার হোসেন ঃ হলো না, রত্না, দাঁড়াও পথিক ১,২, বন্দিনী, বিষ, বিশ্বাসঘাতক
শেখ আবদুল হাকিম ঃ দড়াবাজ স্পাই ১, ২, কামিনী, আততায়ী ১, ২, বিষদাঁত
রকিব হাসানঃ বিদেশ যাত্রা ১, ২, অবসর বিনোদন, মৃত্যুচুম্বন
ইউসুফ ফারুক ঃ দ্বীপ বিভীষিকা
ঊর্মি রহমান ঃ তাহলে কে, মধুচন্দ্রমা, ওরা কোথায়, রক্তাক্ত বড়দিন
শওকত হোসেন ঃ রানওয়ে জিরো এইট, শুভ্রশত্রু, অন্তর্ঘাত, উপদ্রব, সন্ত্রাস
হিফজুর রহমান ঃ ধূসর দেয়াল, অতল প্রলোভন
সুধাময় কর ঃ কামিনী কাঞ্চন ১, ২
কাজি মাহবুব হোসেন ঃ গ্যালাক্সি পেরিয়ে, উত্তরাধিকার, অশুভ সঙ্কেত
মোবারক হোসেন খান ঃ হত্যাকারী
বিশু চৌধুরী ঃ ছায়া শিকারী ১, ২, অন্ধচক্র
হাসান উৎপল ঃ ফেরারী, মৃত্যুদূত
মামনুন শফিক ঃ নগ্নমুখ
রওশন জামিল/কাজী আনোয়ার হোসেন ঃ দাগী আসামী ১, ২
নিয়াজ মোরশেদ/কাজী আনোয়ার হোসেন ঃ স্যাবটাজ ১, ২
নিয়াজ মোরশেদ ঃ মরণ ফাঁদ ১, ২, বন্দীশিবির ১, ২
মার্থা মেকেনাঃ আমি গুপ্তচর
সেলিম হোসেন টিপু ঃ গুণ্ডা, শোধ নেবে?
মোস্তাফিজুর রহমান ঃ আমি উন্মাদ?
খন্দকার মজহারুল করিম ঃ সব মানুষের পৃথিবী
ইফতেখার আমিন ঃ মরীচিকা ১, ২, ক্ষুরদাত
কাজী সারোয়ার হোসেনঃ আড়াল
বাবুল আলম ঃ নর্তক
মোনা চৌধুরী ঃ তিন মিনারে খুন
রোকসানা নাজনীনঃ তৃতীয় নয়ন
তাহের শামসুদ্দীনঃ একদিন সকালে, লোভে পাপ

আমার কথা

প্রফেসর আব্দুস সালাম

এফ. আর. এস., ডি. এস সি., ফিজিসিস্ট

পার্কলেন, উইম্বলডন।

যদ্দূর জেনেছি এ বইয়ের মুখ্য নায়ক আমি। গত বছরের এপ্রিল মাসের সতেরো তারিখ থেকে মে মাসের ছাব্বিশ তারিখের মধ্যকার ঘটনাগুলো নাকি আমিই ঘটিয়েছি।

ব্যাপারটা পুরোপুরি বিশ্বাস হয় না আমার, আবার হেসেও উড়িয়ে দিতে পারি না। আমাকে একটা ফটোগ্রাফ দেখানো হয়েছে। ইস্পানিয়ার জনৈক ফটোগ্রাফার (অবশ্যই খবরের কাগজের) তুলেছেন ছবিটি। পাঠানোও হয়েছে ইস্পানিয়া থেকেই। ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে ঠিক আমারই মত দেখতে এক লোক বড়সড় একটি গাড়ি থেকে নামছে। জায়গাটা জোভোগোরোড। এরপরও বিশ্বাস হতে চায় না। ওই শহরে কখনোই যাইনি আমি। তাছাড়া ছবিটির ব্যাকগ্রাউণ্ডে মেশিন গান হাতে সৈন্য আর ব্যারিকেড দেখে ভড়কে গেছি আরও। কোন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র পছন্দ নয় আমার। আর গোলাগুলির শব্দ তো অসহ্য লাগে।

আমার নাম পড়ে পাঠকদের নিশ্চয়ই খটকা লেগেছে। সেটাই স্বাভাবিক। হ্যাঁ, আমি বাঙালী। পড়তে এসেছিলাম ইংল্যাণ্ডে। ফিরে যাইনি আর। রয়ে গেছি এখানেই। এখন ইংল্যাণ্ডের নাগরিক। বাবা-মা মারা গেছেন, ভাই-বোনও নেই, ফলে দেশের সঙ্গে সম্পর্ক চুকেই গেছে প্রায়। পাঁচ-সাত বছর পর পর হয়তো যাওয়া হয় একবার, ব্যস। তবে দেশে গেলে একটা ব্যাপারে ভুল হয় না। বই কিনি প্রচুর। মাসুদ রানা সিরিজের বই। আমি মাসুদ রানার ভক্ত। বাঙালীদের গর্ব করার মত একজন চরিত্র বটে সে। এখানকার জেমস বণ্ডের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। মাঝে-মধ্যে ইচ্ছে করে সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে রানার মত হয়ে যাই—স্পাই।

যাহোক, অন্য প্রসঙ্গে চলে গিয়েছিলাম। আবার মূল প্রসঙ্গে ফিরছি। নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউনে আমাকে নিয়ে রিপোর্ট বেরিয়েছে। লিখেছেন হেনরী লিনফোর্ড। প্রমাণ করেছেন, আমিই ছবির সেই মানুষটি। আমিই নাকি জোভোগোরোডে গিয়েছিলাম। হেনরী সাহেবও সেসময় ওখানে ছিলেন।

পাঠকদের জানিয়ে রাখছি, মার্কিন সাংবাদিকদের কোন বিশ্বাস নেই। ওরা তিলকে তাল আর তালকে তিল বানাতে ওস্তাদ। তবে মিস্টার হেনরী লিনফোর্ড যদি জিজ্ঞেস করে বসেন, 'ওই পাঁচ সপ্তাহ কোথায় ছিলেন আপনি, কি করেছিলেন?' সেক্ষেত্রে আমি লা জবাব। পুরো ঘটনাটিকে স্বীকৃতি না দিয়ে উপায় থাকবে না আমার।

তবে কিছু ব্যাপার অবশ্যই জানা আছে আমার। সেগুলোর ক্ষেত্রে আমি সন্দেহমুক্ত। পাঠকদেরও তাই জানিয়ে দিচ্ছি।

আমার বয়স চল্লিশ। অবিবাহিত। পেশায় পদার্থবিদ। সতেরোই এপ্রিলের চার মাস আগে এক ইন্সট্রুমেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীতে চাকরি নিই আমি। ওখানে জটিল এবং নতুন এক ধরনের অ্যাস্ট্রোনমিকাল যন্ত্র তৈরির কাজ করছিলাম। বলাইবাহুল্য কাজটা কঠিন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ রাতদিন কাজ করেছি। প্রচণ্ড শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রমে কাহিল হয়ে পড়েছিলাম। দিনকে দিন স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। এপ্রিলের দশ তারিখে ডাক্তার দেখালাম। উনি বললেন হয় লম্বা ছুটি, নয়তো শয্যা নেয়ার জন্যে তৈরি হতে হবে।

প্রথমে কোম্পানীর কাজটা সারব ঠিক করলাম। ছুটি নেব কদিন পর। হাউজকিপারকে বলে দিলাম চিঠি এলে ফরওয়ার্ড করে দিতে। তারপর এল সেই সতেরোই এপ্রিল। ভোর সাড়ে ছটায় বেরিয়ে পড়লাম গাড়ি নিয়ে। একা। কর্নওয়ালের ট্রুরোতে যাব। বেলা দেড়টায় পৌঁছলাম লন্সটনে। লাঞ্চ সারতে ঢুকলাম এক হোটেলে।

এরপর থেকে স্মৃতি আর ভাল কাজ করেনি। হোটেলে ঢোকার কথা মনে আছে। কিন্তু বেরিয়েছিলাম কিনা মনে পড়ে না। এক কাপ কফি পান করেছিলাম। আর কিছু

খেয়েছিলাম কিনা জানি না। রহস্যময় আগন্তুক রবিন্সের কথা কিচ্ছু মনে নেই। আবছা মনে পড়ে, অসুস্থ বোধ করছিলাম। হোটেলের লাউঞ্জে চলে গিয়েছিলাম, খানিকক্ষণ বসে থাকার জন্যে। হিপ পকেট থেকে বার করেছিলাম মাসুদ রানার একটা কপি। ওটা নিয়ে এসেছিলাম সময় কাটানোর জন্যে। কভারে এক সুদর্শন যুবকের ছবি। হাতে ওয়ালথার পি. পি. কে। মনে হলো, বৃষ্টি থামার জন্যে অপেক্ষা করছি। তারপরই দেখলাম গাড়ি চালাচ্ছি। কেমন যেন ঘুম ঘুম ভাব, আচ্ছন্নতা। নিজেকে আবিষ্কার করলাম বেল প্যারিস এক্সপ্রেসে। ট্রেনের গার্ড জোর করে হুইস্কি ঢালছে, আমার দাঁত ফাঁক করে। সেদিনটি ছিল মে মাসের ছাব্বিশ তারিখ। এই পাঁচ সপ্তাহের ভেতর কি যে ঘটে গেছে কিছুই জানা নেই আমার। মে-র ছাব্বিশ তারিখে বেরিয়েছিলাম এক কাপড়ে। সঙ্গে ছিল পাসপোর্ট। ছিল না বাক্স প্যাঁটরা বা অন্য কোন জিনিসপত্র। আমার বিশ্বাস, প্যান্টের পকেটে একটা ফটো ছিল—কার তা জানি না—তবে একজন মহিলার। পরে অবশ্য ফটো বা পাসপোর্ট কোনটাই পাইনি।

পরবর্তী কমাস খুব ভুগলাম। ভীষণ ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। খানিকটা সামলে ওঠার পরে যে গল্পটা আপনারা পড়বেন সেটা শুনলাম। আমাকে নিয়ে গল্প অথচ আমি নিজেই জানি না। ব্যাপারটা অস্বস্তিকর নয়? যাহোক, যে কাণ্ডটা আমি ঘটিয়েছি (!) সেটা আপনারাও শুনুন।

প্রথম পর্ব

এক

এপ্রিল সতেরো

দুপুর সাড়ে বারোটা। ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন প্রফেসর সালাম। ক্লান্ত হওয়ারই কথা। ইতোমধ্যে প্রায় তিনশো কিলোমিটার পাড়ি দিয়েছেন, গাড়ি চালিয়ে। ঘণ্টাখানেক বাদে লন্ডনের দ্য রয়্যাল ক্রাউন হোটেলের বিশাল চত্বরে প্রবেশ করল তাঁর গাড়ি। নেমে এসে আড়মোড়া ভাঙলেন প্রফেসর। লক করলেন দরজাগুলো।

নিপুণ হাতে কাজটা সারলেন প্রফেসর। তীক্ষ্ণ চোখজোড়া জরিপ করে নিল চারপাশটা। ধূসর স্যুটে চমৎকার মানিয়েছে তাঁকে। ভদ্রলোক সকলের শ্রদ্ধাভাজন। তাঁর বক্তৃতা শুনে তাক লেগে যায় শ্রোতাদের। আবেগকে মোটেই পাত্তা দেন না তিনি। যা বলার যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে বলেন।

এ মুহূর্তে তাঁর কল্পনায় ভেসে উঠল হোটেলের চমৎকার একটা ঘর—নরম বিছানা। কি দরকার গাড়ি নিয়ে দাবড়ে

বেড়ানোর? এখানেই তো বিশ্রাম নেয়া যায়। পরমুহূর্তেই চিন্তাটাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করলেন তিনি। হোটেলে ঢুকে স্টেইকের অর্ডার দিলেন। ইত্যবসরে পান করলেন এক কাপ কফি।

হঠাৎই মনে পড়ে গেল অতীত দিনের কথা। কেমব্রিজে পড়ার সময় গুপ্তচর হওয়ার খুব শখ হয়েছিল তাঁর। নিজেকে হিরো কল্পনা করতে সে সময় কি ভালই না লাগত। গোপন মিশন নিয়ে কোন দেশে ঢুকে পড়া, অ্যাডভেঞ্চার, মৃত্যুর ঝুঁকি...

স্টেইক খেতে খেতে যৌবনের সেই দিনগুলোর কথা ভাবছেন প্রফেসর। ডাইনিংরুমটা ফাঁকাই প্রায়, কেবল একজন মোটা মত, সাদা চুলের লোক লক্ষ করছে তাঁকে। সতর্ক চোখে।

'লাভলি ডে, স্যার,' চোখাচোখি হতেই বলে উঠল লোকটি।

'হ্যাঁ,' বললেন প্রফেসর সালাম। তারপর ভদ্রতার খাতিরেই যোগ করলেন, 'চমৎকার দিন।'

কথা বাড়ানোর কোন ইচ্ছে নেই প্রফেসরের। কিন্তু পাকা চুলো নাছোড়বান্দা।

'লন্সটনে থাকবেন নাকি, স্যার?'

মাথা নাড়লেন প্রফেসর।

'ট্রুরোতে যাচ্ছি। আপনি কি এই হোটেলেই আছেন?'

অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়ল লোকটি। তারপর খানিকক্ষণ ভাবল কি যেন। হঠাৎই নিজের চেয়ারটা নিয়ে এল প্রফেসরের টেবিলে। ঝুঁকে পড়েছে।

'ছ মাস আগে চীনে ছিলাম আমি। তার আগে সাউথ আমেরিকায়, তারও আগে তুরস্কে। গত ছ বছর ধরে ইংল্যাণ্ডের বাইরে কাটিয়েছি। প্রতিটা মুহূর্ত অপেক্ষা করেছি দেশে ফেরার জন্যে। ভেবেছিলাম ইংল্যাণ্ডে ফিরে এসে আর নড়াচড়া করব না। কিন্তু তা বোধহয় আর হলো না। মাস খানেক আগে দেশে ফিরেছি, আর এরমধ্যেই বোর হয়ে গেলাম—'

'রিটায়ার করেছেন?' মাঝপথে জানতে চাইলেন প্রফেসর।

লোকটি নিশ্চুপ। চেয়ে রয়েছে প্রফেসরের দিকে, ঠাণ্ডা চোখে।

'স্যার,' বলল লোকটি, 'আপনাকে আগে কোথায় দেখেছি বলুন তো?'

'বছরখানেক আগে,' জবাবে বললেন প্রফেসর, 'পত্রিকায় আমাকে নিয়ে খুব লেখালেখি হয়েছিল। খামোকা। তখনই দেখেছেন হয়তো।'

'ও হ্যাঁ, হ্যাঁ!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল লোকটি, 'মানুষের চেহারা সহজে ভুলি না আমি। কিন্তু নাম... কি যেন, নাম...এক মিনিট...অ্যাঁ...সালাম...প্রফেসর সালাম।

আপনি তো, স্যার সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন—আপনি বলেছিলেন নিউক্লিয়ার এনার্জিকে মানুষের কাজে-অকাজে দু'টোতেই লাগানো যায়। তাই না?'

'মোটেই না,' দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন প্রফেসর। 'আমি বলেছিলাম নিউক্লিয়ার এনার্জি নিয়ে বেশি মাতামাতি করলে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে।'

'কফি খাবেন?' জানতে চাইল লোকটি।

'খেয়েছি।'

'আবার খান।'

কফির অর্ডার দিয়েছে লোকটি। কফি পান করতে করতে উৎসুক শ্রোতাকে নিজের দৃষ্টিভঙ্গির কথা বর্ণনা করতে ভালই লাগছে প্রফেসরের। লোকটির নামও জেনে নিয়েছেন। হ্যামণ্ড রবিন্স। রবিন্স কথার রাজা। বিদেশনীতির ব্যাপারে প্রচুর জ্ঞান তার। রবিন্সের পেশা কি জানার জন্যে কৌতূহলী হয়ে উঠলেন প্রফেসর। আবার কোন রিপোর্টার নয়তো? শেষমেষ রবিন্স নিজেই কৌতূহল মেটাল। জানাল প্রফেসরের প্রতি তার আগ্রহের কারণ :

'গানস অ্যাণ্ড ব্লিস-এর নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই? পৃথিবীর বড় কয়েকটা অস্ত্র কোম্পান্নীর একটা। ম্যানুফ্যাকচারার।' সামান্য থামল রবিন্স। 'আপনাকে কথা দিতে হবে, আমাদের আলোচনার ব্যাপারে কাউকে কিছু জানাবেন না।'

'বেশ, কথা দিলাম।'

চুরুটে লম্বা টান মারল রবিন্স।

'একটা কথা কি জানেন, মানুষকে কোন বিশ্বাস নেই। কিছু একটা আবিষ্কার করলেই হলো, সেটার খারাপ দিকটাই সবার আগে কাজে লাগাতে চায়। হিরোশিমা-নাগাসাকিতে যেমন অ্যাটম বোমা ফেলে দিল।'

'সাইন্স কিন্তু গড়তে চায়, ধ্বংস চায় না,' কঠিন শোনাল প্রফেসরের গলা। 'অতীতে সাইন্সের অপব্যবহার হয়েছে ঠিকই কিন্তু সাইন্স এখন নিজেকে প্রটেক্ট করতে শিখেছে।'

মাথা নাড়ল রবিন্স।

'কথাটা ঠিক নয়, প্রফেসর। বিজ্ঞানীরাই তো বিজ্ঞানকে কন্ট্রোল করে। ক্ষমতার মোহ সবারই আছে। অনেক ছোট-খাট দেশও এখন সুপার নিউক্লিয়ার বোমা বানাচ্ছে।'

সন্দেহ হলো প্রফেসরের। লোকটা তাঁকে এসব কথা শোনাচ্ছে কেন? উদ্দেশ্যটা কি?

স্থির দৃষ্টিতে রবিন্সকে তাঁর দিকে চেয়ে থাকতে দেখে হেসে ফেললেন প্রফেসর।

'জানি। কিন্তু কারা বানাচ্ছে বলুন তো।'

'বলছি, তার আগে,' শান্ত স্বরে বলল রবিন্স। 'একটা প্রশ্ন করি—আচ্ছা, দুনিয়ার বিখ্যাত কয়েকটা ল্যাবোরেটরীর নাম করুন তো।'

কয়েকটা নাম বললেন প্রফেসর।

'হলো না, প্রফেসর। ওগুলোর একটাতেও ওসব বোমা তৈরি হচ্ছে না। জোভোগোরোড়ের নাম শুনেছেন? শোনেননি বোধহয়। জোভোগোরোড হচ্ছে ইক্সানিয়ার রাজধানী। ওখানেই তৈরি হচ্ছে বোমা।'

হাসলেন প্রফেসর।

'বোমা তৈরিতে যে খরচ পড়বে তাতে ইক্সানিয়ার তো দেউলিয়া হয়ে পড়ার কথা।'

'আমি তামাশা করছি না, প্রফেসর,' অসহিষ্ণু শোনাল রবিন্সের কণ্ঠ। 'ইক্সানিয়া যদিও খুব একটা উন্নত দেশ নয়, তবে ওরা খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষী। এতদিন ওরা অন্যান্য ধনী দেশগুলোকে হিংসে করে এসেছে, কিন্তু এখন উল্টে গেছে ছক। ইউরোপের অনেক দেশই ঈর্ষা করতে শুরু করেছে ওদের।'

'কেন?'

'একজন লোকের জন্যে।'

আগ্রহী হলেন প্রফেসর। ঝুঁকলেন সামনে।

'কে সে?'

ভ্রূ কুঁচকে চুরুটটার দিকে চেয়ে রইল রবিন্স।

'তার সম্বন্ধে জানা যায়নি বড় একটা,' বলল সে। 'জুরিখ আর বন ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া করেছে লোকটি। মেধাবী ছাত্র ছিল। বন থেকে শিকাগোতে গিয়েছিল। ওখানে প্রায় বছর ছয়েক কাজ করেছে। তিন বছর আগে শিকাগো

থেকে ফিরে গিয়েছে জোভোগোরোডে। তার নাম ভিজিল।'

'ভিজিল,' বিড়বিড় করে বললেন প্রফেসর। 'নাম শুনেছি। ওর একটা আর্টিকেল পড়েছিলাম। খুবই সাধারণ মানের লেখা। ও কি নিউক্লিয়ার বোমা বানাচ্ছে নাকি?'

'বানিয়ে ফেলেছে। তিন সপ্তাহ আগে মহড়াও দিয়েছে, জোভোগোরোডের একশো কিলোমিটার উত্তরে। গানস অ্যাণ্ড ব্রিসের একজন প্রতিনিধি ছিল সেখানে—অবশ্যই ছদ্মবেশে। যে পাহাড়ে মহড়া হয়েছে সেটার অবস্থা কাহিল। পঞ্চাশ হাজার টন পাথর ছিটকে পড়েছে চারদিকে। সেটা অবশ্য কিছুই নয়। ওরা যে বোমা বানাচ্ছে তার একশো ভাগের মাত্র এক ভাগ শক্তির একটা বোমা ফাটিয়েছে।'

'বলেন কি!' বিস্মিত দেখাচ্ছে প্রফেসরকে। 'তবে তো অনেক দূরই এগিয়েছে। ভয়ঙ্কর!'

'তাতে কোন সন্দেহ নেই,' বলল রবিন্স। 'পারমাণবিক বোমার চরম উৎকর্ষ সাধন করেছে ওরা। ইউরোপ এমন কি আমেরিকাকে পর্যন্ত নাড়িয়ে দিতে পারবে।'

প্রফেসর নির্বাক। জানালার ওপাশে হোটেলের বাগান। সেদিকে চোখ তাঁর। বসন্তের বিকেল। ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। প্রফেসরের হঠাৎ মনে হলো দুঃস্বপ্ন দেখছেন। চমকে উঠলেন তিনি। কাঁপছেন।

'আমাকে এসব কথা শোনালেন কেন? আমাকে তো আপনি বলতে গেলে চেনেনই না।'

আরেকটু ঝুঁকল রবিন্স।

'কিছুদিন আগে ইস্পানিয়া সরকারের এক দূত এসেছে ইংল্যাণ্ডে। এসে বলল, মেশিনারী কিনবে: একটা ফুড ফ্যাক্টরীর জন্যে। গানস অ্যাণ্ড ব্রিসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে সে। লোকটি হয় খাবার তৈরির ফ্যাক্টরী সম্পর্কে কিছুই জানে না আর না হয় যন্ত্রপাতিগুলো অন্য কাজে লাগাবে। আমরা জানি কলকাঠি নাড়ছে গুরুত্বপূর্ণ কেউ একজন। টাকা কোন ব্যাপার নয় তার কাছে। ওদের সঙ্গে অবশ্য চুক্তি করা হয়েছে। ফলে ভিজিলকে অন্তত কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে। যন্ত্রপাতি সাপ্লাই দিতে সময় নেয়া হবে। আর সেই ফাঁকে প্রয়োজনীয় তথ্য আদায়ের চেষ্টা করব আমরা। প্রফেসর, আমি আপনাকে একটা প্রস্তাব দিতে চাই। তার আগে আমার পরিচয়টা খোলাসা করি: আমি গানস অ্যাণ্ড ব্রিসের ফরেন রিপ্রেজেন্টেটিভ। কোম্পানীর একজন ডিরেক্টরও বটে।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন প্রফেসর। রবিন্সকে এখন ঝানু ব্যবসায়ীর মত দেখাচ্ছে।

'আমার প্রস্তাবটা হচ্ছে : ইস্পানিয়ান দূতকে ফলো করার জন্যে অপেক্ষা করছি আমি। সে জোভোগোরোডে রওনা হলেই ফলো করব। ইস্পানিয়ায় লোক-জন আছে আমার। তারা লক্ষ রাখবে দূতটির ওপর। জানতে চেষ্টা করবে কে রয়েছে ওর পেছনে। ইস্পানিয়ার সরকারের কাছ থেকে আসল

তথ্য বার করা যাবে না। কাজটা এলেবেলে নয়, সেজন্যেই একজন টেকনিকাল অ্যাডভাইজার দরকার আমাদের। নিউক্লিয়ার এনার্জি সম্পর্কে ভিজিল ছাড়া আর যাঁর ওপর নির্ভর করা যায় তিনি হচ্ছেন আপনি। প্রফেসর সালাম, আমি আপনাকে সঙ্গে করে জোভোগোরোডে নিয়ে যেতে চাই। আপনি আমাদের কোম্পানীর টেকনিকাল অ্যাডভাইজারের পোস্টটা নিন, প্লীজ।'

পরিস্থিতি বুঝে উঠতে খানিকটা সময় ব্যয় করলেন প্রফেসর।

'তাই বলুন,' শেষ পর্যন্ত বললেন তিনি।

'চিন্তা করবেন না,' ধীর গলায় বলে চলেছে রবিন্স, 'আপনার কথা কেউ জানতে পারবে না। গোপনে কাজ করবেন আপনি। যত টাকা চান পাবেন।'

'যদি আপনার প্রস্তাবে রাজি না হই?'

'হবেন, প্রফেসর। আমি জানি রাজি হবেন। মানবতার স্বার্থে রাজি না হয়ে উপায় নেই তো। ভাবুন একবার, ইউরোপের ছোট্ট একটা দেশ যদি পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হয় তবে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপারটাই ঘটবে। আপনি রাজি হলে বিজ্ঞান আর সভ্যতা দুটোই উপকৃত হবে, প্রফেসর।'

উঠে দাঁড়ালেন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ প্রফেসর। কাটা কাটা কথায় বললেন, 'মিস্টার রবিন্স, আগেই বলেছি সাইন্সকে

আর ইচ্ছেমত অপব্যবহার করা যাবে না। আবারও বলছি সে কথা। আপনি আমাকে সাইন্স আর মানবজাতির উপকার করতে বলছেন—আমি শুদ্ধ করে দিচ্ছি। আসল ব্যাপার হচ্ছে, আপনি গানস অ্যাণ্ড ব্লিসের অংশীদারদের স্বার্থ দেখছেন—মানুষের নয়। আপনারা নিজেরাই বোমা বানাতে চান, আমাকে পেলে আপনাদের উপকার হয়, তাই না? জেনে রাখুন, আপনার প্রস্তাবে রাজি নই আমি।'

হেসে উঠল রবিন্স।

'মত আপনি পাল্টাবেনই, প্রফেসর, আমার ভাল মতই জানা আছে। আমাদের জন্যে যদি কাজ না-ও করেন তবু মানবতার আবেদনকে আপনি পায়ে ঠেলতে পারবেন না।'

শক্ত হলো প্রফেসর সালামের চোয়াল।

'সামান্যতম সম্ভাবনাও নেই, মিস্টার রবিন্স,' কঠিন শোনাল প্রফেসরের গলা।

দুই

এপ্রিল সতেরো-আঠারো

উঠে পড়ল রবিন্স। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি, তবে সরু চোখ দুটো জ্বলছে। ক্রুদ্ধ। মুখ খুলল ও। দূরাগত মনে হলো ওর কণ্ঠস্বর।

'আমি হাল ছাড়ছি না, প্রফেসর। আগামী দিন কয়েক প্যারিসের রিটজ হোটেলে থাকব। আজই রওনা হচ্ছি, প্লেনে। মত পাল্টালে...'

কর্ণপাত করলেন না প্রফেসর। ক্লান্ত তিনি। কাজ করতে চাইছে না মাথা। খানিক পরে চোখ যখন তুললেন তখন নেই রবিন্স। চলে গেছে।

চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন প্রফেসর। হাত বাড়ালেন কফির কাপে। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। মাথা রাখলেন হাতে, বাইরের দিকে দৃষ্টি। আকাশে মেঘ করেছে। ঝিরঝির বৃষ্টি। আবারও মনে হলো দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছেন তিনি। নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছেন নিজের ওপর। ত্রস্ত পায়ে বেরিয়ে এলেন

লাউঞ্জে।

আগুন জ্বালানো হয়েছে। ওটার কাছেই একটা চেয়ার পেতে বসলেন প্রফেসর। ঘুমে জড়িয়ে আসছে দু চোখ। ভারি হয়ে আসছে চোখের পাতা। কি সব খাপছাড়া ব্যাপার দেখতে পাচ্ছেন যেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, ধ্বংসের ছবি। পাক সেনাদের অত্যাচার–সুপার নিউক্লিয়ার বোমা।

আর্তচিৎকার করে জেগে উঠলেন তিনি। এক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন আগুনের দিকে। মাথা গুলিয়ে গেছে। চিন্তা ভাবনাগুলোকে পরপর সাজাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। রবিন্স। ওই উটকো লোকটাকে মনের পর্দা থেকে তাড়াতে পারছেন না কিছুতেই। লোকটার সাপের মত দৃষ্টি, আত্মবিশ্বাস–কোনটাকেই অস্বীকার করা যায় না। লোকটার কথা যদি সত্যি হয় তবে যে করে হোক ঠেকাতে হবে ভিজিলকে। কিন্তু কিভাবে? দরকার রানার মত একজন দুঃসাহসী লোক; যে একই সঙ্গে ভিজিল, ইক্সানিয়ার সরকার আর গানস অ্যাণ্ড ব্লিসকে শায়েস্তা করতে পারবে।

কিন্তু বাস্তবে অমন লোক কোথায়? অন্যমনস্কভাবে পকেট থেকে মাসুদ রানা সিরিজের বইটা বার করলেন প্রফেসর। ওটা খুলতেই বেরিয়ে পড়ল চল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা। পড়ছেন প্রফেসর :

বিড়ালের ক্ষিপ্রতায় লাফিয়ে দেয়ালের ওপর দিকটা আঁকড়ে ধরল রানা। নিচে তাকাতেই দেখতে পেল লোহার

মই বেয়ে দ্রুত উঠে আসছে গুলজার। হাতে পিস্তল। একটা জানালার নিচে আশ্রয় নিল রানা। মুহূর্তের জন্যে নিরাপদ বোধ করল, তবে গুলজার দেখে ফেলেছে ওকে। পিস্তলে লোকটার আশ্চর্য হাত। নির্ভুল নিশানায় গুলি পাঠাতে পারে। বিপদে পড়ে গেছে রানা। ঢিবঢিব করছে হৃৎপিণ্ড। তবে মাথা ঠাণ্ডা রাখল ও। আলগোছে কোমর থেকে সিল্কের রশিটা খুলে নিল। জাপানের এক জেলে জিনিসটা দিয়েছিল ওকে, বন্ধুত্বের চিহ্ন। লোকটির জীবন বাঁচিয়েছিল রানা। দ্রুত হাতে রশিটা গোল করল ও, গিঁট দিল। সতর্ক চোখে চাইছে নিচের দিকে। গুলজার আর মাত্র ফুট কয়েক নিচে। ওঠানামা করছে ওর বুক। ঘর্মাক্ত মুখটা এখন আরও কুৎসিত দেখাচ্ছে। তবে পিস্তল তৈরিই আছে শিকারের অপেক্ষায়। রশিটা ছুঁড়ে দিল রানা, নিঃশব্দে। পরমুহূর্তেই হাত থেকে অস্ত্রটা গায়েব হয়ে গেল গুলজারের। বিহ্বল দৃষ্টিতে চাইল রানার দিকে। আতঙ্ক গ্রাস করেছে তাকে। দ্রুত নামতে চেষ্টা করছে।

'একটু নড়াচড়া করলেই মরবে,' কঠিন গলায় বলল রানা।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন প্রফেসর সালাম। রানা পড়তে এখনও ভাল লাগে। কেমন যেন সাহস বেড়ে যায়। নিজেকে এখন আর বিজ্ঞানী বলে মনে হচ্ছে না তাঁর। আবারও মাথাচাড়া দিল পুরানো ইচ্ছেটা। রানাকে ঈর্ষা হচ্ছে। জমে গেছে

বইটা, পড়ে চললেন প্রফেসর। পাতায় পাতায় শিহরণ। এ বইটিতে রানার ভূমিকা খুবই বলিষ্ঠ। গোপন মিশন নিয়ে ঢুকে পড়েছে সে ইসরাইলে।

রবিন্সের কথা আপাতত বেমালুম ভুলে গেছেন প্রফেসর। একটানা একশো বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়ে গেলেন বইটা। তারপর বন্ধ করে পকেটে ঢোকালেন। জানালায় বৃষ্টির ছাঁট এসে লাগছে। রানা সত্যিকারের রক্তমাংসের মানুষ হলে দুনিয়ার বিরাট উপকার হত। রবিন্স, ভিজিল আর তার বোমা সবই নস্যি হয়ে যেত তার সামনে। তাছাড়া এখন কি করা উচিত তাও বুঝতে পারত রানা। চুপ করে চেয়ারে বসে ভাবছেন প্রফেসর। পলকহীন চোখে বৃষ্টি দেখছেন। অভ্যস্ত হাতে তামাক ভরতে লাগলেন পাইপে।

অবসাদগ্রস্ত প্রফেসরের সর্বাঙ্গে আচমকা যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল।

'মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে হবে,' বিড়বিড় করে বললেন প্রফেসর। মুহূর্তের জন্যে শিথিল হলো মুখের পেশীগুলো, তারপর আবার দৃঢ় হয়ে গেল।

'প্রথম কাজ হচ্ছে,' দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন তিনি, 'গানস অ্যাণ্ড ব্লিসকে ঠেকানো। আজ রাতেই জোভোগোরোড রওনা হবো।'

হঠাৎ যেন চমক ভাঙল প্রফেসরের। একথাগুলো কি তাঁর মুখ থেকেই বেরিয়েছে? নাকি অন্য কেউ বলে গেছে কানের

কাছে? হয়েছেটা কি তাঁর? ঘরে কেউ নেই। আপন মনেই কথা বলছেন তিনি।

অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছেন প্রফেসর। ইচ্ছে করছে, এক ছুটে বাইরে বেরিয়ে যেতে। মনে হচ্ছে, বহুদিন যেন বুক ভরে তাজা বাতাস নেয়া হয়নি। ট্রুরোতে ছুটি কাটাতে যাবেন তিনি। যাবেনই। রবিন্স, ভিজিল আর দুনিয়ার মানুষ—কারও পরোয়া করেন না তিনি। তাঁর চাই শুধু বিশ্রাম, বিশ্রাম আর বিশ্রাম। অন্য মানুষদের নিয়ে কেন ভাববেন তিনি? তাঁর কি ঠেকা পড়েছে?

লন্সটন থেকে ট্রুরোর দিকে যাওয়ার পথটা নির্জন। প্রফেসর ভাবলেন, টাটকা বাতাসে খানিকটা তরতাজা বোধ করবেন। কিন্তু এঞ্জিনের শব্দ আর বাতাসের গর্জন আরও বেশি কাহিল করে দিচ্ছে তাঁকে। ঘুম পাড়িয়ে দিতে চাইছে। গাড়ি চালানোর সময় আনমনে হঠাৎ একটু ঝিমিয়েও নিলেন তিনি। সেই ফাঁকে গাড়িটা রাস্তা ছেড়ে চলে গেল পাশে। ভয় পেয়ে গেলেন প্রফেসর। দ্রুত পালাতে হবে। মাথার ভেতর শুনতে পাচ্ছেন একটা কণ্ঠস্বর। অনবরত উপদেশ দিয়ে চলেছে। তারপর আরেকটা কণ্ঠ। রবিন্সের। বহুদূর থেকে যেন ভেসে আসছে কথাগুলো।

'মানবতার স্বার্থে মত আপনি পাল্টাবেনই, প্রফেসর...মত আপনি পাল্টাবেনই, প্রফেসর...মত আপনি পাল্টাবেনই, প্রফেসর...'

এক্সিলারেটরে পায়ের চাপ বাড়ল আরও। কিন্তু তারপরও তাড়ানো যাচ্ছে না শব্দগুলোকে। উপরন্তু তারাই তাড়া করে ফিরছে তাঁকে। শক্ত করে স্টিয়ারিং হুইলটা চেপে ধরলেন প্রফেসর। কপাল থেকে ঘাম গড়িয়ে ঢুকে পড়েছে দু চোখে।

'মানবতার স্বার্থে মত আপনি পাল্টাবেনই...' ক্রমান্বয়ে অন্য একটা বাক্য চলে এল প্রথমটার জায়গায়। জোরাল,জরুরী গলায়, নামতার মত করে একটা বাক্য বারবার বলে চলেছে কে একজন। মাসুদ রানার কণ্ঠ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন এখন প্রফেসর।

'আজ রাতেই জোভোগোরোড রওনা হব...আজ রাতেই জোভোগোরোড রওনা হব। আজ রাতেই জোভোগোরোড রওনা হব।'

চিৎকার করে আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে হাত তুললেন প্রফেসর।

তীব্র গতিতে ছুটছে তখন গাড়ি। সোজা গিয়ে পড়ল রাস্তার পাশের খাদে। মুহূর্তে জ্ঞান হারালেন প্রফেসর।

রাত। চাঁদ উঠেছে। চোখ মেললেন প্রফেসর। খাদে পড়ে রয়েছেন। উঠে বসলেন কোনমতে। উল্টে গেছে গাড়িটা। মাথায় খুব যন্ত্রণা বোধ করছেন তিনি। হাত দিতেই ভেজা ভেজা ঠেকল। রক্ত চটচট করছে। দুর্বল পায়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রফেসর। চাঁদের আলো পানিতে পড়ে চকচক করছে।

এগোলেন সেদিকে। ছোট একটা নদী। আঁজলা ভরে পানি তুলে নিয়ে ব্যথার জায়গায় লাগালেন। বরফের মত ঠাণ্ডা পানি, ফলে সুবিধেই হলো। ধীরে ধীরে গাড়ির দিকে হেঁটে গেলেন প্রফেসর। অতিকষ্টে স্যুটকেসটা বার করতে পারলেন। উঠে এলেন রাস্তায়। থমকে দাঁড়াতে হলো, কোথায় যাবেন জানা নেই। হঠাৎই কথা বলে উঠলেন। ঝাড়া মুখস্থ করা কোন বিষয় আওড়াচ্ছেন যেন।

'তো,' শান্তস্বরে বললেন তিনি, 'আমার কাজ হচ্ছে মানুষকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো।' সামান্য বিরতি দিয়ে বলতে লাগলেন আবার। এবার আগের চেয়েও জোরাল কণ্ঠে।

'প্রথম কাজ হচ্ছে গানস অ্যাণ্ড ব্লিসকে ঠেকানো—আজ রাতেই জোভোগোরোড রওনা হব।'

কোটের কলার তুলে দিলেন প্রফেসর। তারপর হাঁটা ধরলেন, দৃপ্ত পদক্ষেপে।

পরদিন বিকেল। স্যুটকেস হাতে এক ভদ্রলোককে প্লাইমাউথের ন্যাশনাল হোটেলে ঢুকতে দেখা গেল। রুম ভাড়া নেবেন। ভদ্রলোকটির দুটি ব্যাপার নজর কাড়ল রিসেপশন ক্লার্কের। একটি হচ্ছে তাঁর মাথার এক পাশের শুকনো রক্ত, আর অন্যটি তাঁর তীক্ষ্ণ, কঠিন চাহনি।

'৪৫৬ নং, স্যার,' বলল ক্লার্ক। 'সই করুন।'

বিনা দ্বিধায় সই করলেন চোট খাওয়া ভদ্রলোক। হল পোর্টারকে ইশারায় ডাকার আগে নামটার দিকে এক ঝলক চাইল ক্লার্ক।

'মিস্টার মাসুদ রানার লাগেজ ৪৫৬ নম্বর রুমে পৌঁছে দাও,' বলল সে।

তিন

এপ্রিল উনিশ-বিশ

মাসুদ রানা লে হাভরে থেকে ট্রেনে চাপল। গন্তব্য প্যারিস। নিজের মনেই বলল, 'সাধ্যমত গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে।' প্রফেসর সালামের পরিচয়ে ভ্রমণ করছে সে। ব্যাপারটা অনেকাংশে নিরাপদ। মাসুদ রানার পরিচয় লোকে জানলে সন্দেহ করতে পারে।

পাসপোর্ট বার করে দেখল ও। সবই ঠিক আছে। মনে মনে হাসল রানা। নিরীহ প্রফেসর ভালই খেল দেখালেন। আমোদ পাচ্ছে রানা। রবিন্স যখন জানবে প্রফেসর সালাম মনে করে মাসুদ রানাকে সব গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে, তখন ওর মুখের অবস্থাটা কেমন হবে? মুচকি হাসল রানা।

বেল বাজিয়ে ওয়েটারকে ডাকল ও। চায়ের অর্ডার দিল। রবিন্সের প্রস্তাব গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। ওদের অ্যাডভাইজার হিসেবে এখন জোভোগোরোড থেকে গোপন

ইনফর্মেশন সংগ্রহ করা সহজ হবে। একটা ব্যাপারে ওদের দুজনেরই মিল রয়েছে : দুজনই ভিজিলকে ঠেকাতে চায়। রুখতে চায় ইস্পানিয়ার নিউক্লিয়ার বোমা তৈরির পরিকল্পনা। কদ্দূর সফল হবে সে পরের কথা। খোদার ওপর ভরসা রাখে ও।

চা খেয়ে রেস্টুরেন্ট বারের দিকে এগোল রানা, খাবারের অর্ডার দেয়ার জন্যে। তারপর বসে বসে অন্যান্য যাত্রীদের দেখতে লাগল। দুজন যাত্রী দৃষ্টি কেড়ে নিল ওর—একজোড়া নারী-পুরুষ। টেবিলে মুখোমুখি বসেছে তারা। মাথা দুটো ঝুঁকে পড়েছে সামনে। মাঝে মধ্যে দু একটা শব্দ কেবল কানে আসছে রানার। খুব সম্ভব রাশিয়ান ভাষায় কথাবার্তা হচ্ছে। মহিলা হঠাৎ মুখ তুলতেই চোখাচোখি হয়ে গেল রানার সঙ্গে।

মাসুদ রানাকে টেনেছে অনেক মেয়েই, কিন্তু বাঁধনে জড়াতে পারেনি। মনটা বড় শক্ত ওর। মুক্ত পুরুষ। এ মুহূর্তে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো ওর। মেয়েটির সম্বন্ধে জানার জন্যে ভেতর ভেতর তাড়না অনুভব করছে সে।

মেয়েটির একহারা গড়ন, ফর্সা গাল দুটোর হাড় সামান্য উঁচু। চোখজোড়া কালো, মায়াবী। কপালের ওপর কগাছা চুল পড়ে অপরূপ দেখাচ্ছে। মুখের গড়নটা চমৎকার। একই সঙ্গে সেখানে কোমলতা আর দৃঢ়তার সংমিশ্রণ। পরনে দামি বাদামী পোশাক। সব মিলিয়ে সত্যিই আকর্ষণীয়!

আত্মবিশ্বাসী চোখ দুটো জরিপ করছে অন্যান্য যাত্রীদের।

রানার চোখে আবারও চোখ পড়ল সুন্দরীর। মেয়েটি চকিতে দৃষ্টি ফেরাল সহযাত্রীর দিকে। সামান্য পরেই উঠে পড়ল ওরা, রেস্টুরেন্ট ছাড়ল।

রানাও ফিরে এল নিজের কম্পার্টমেন্টে। কৌতূহল অনুভব করছে। উত্তেজিত। দেখা হবে। সে জানে, কোথাও না কোথাও, কোনভাবে না কোনভাবে আবারও দেখা হবে মেয়েটির সঙ্গে।

প্যারিসে পৌঁছেই রানা ট্যাক্সি নিয়ে রওনা হলো রিটজ হোটেলের দিকে। রবিন্সের সঙ্গে দেখা করবে। একটা ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। রবিন্সকে কিছুতেই বুঝতে দেয়া যাবে না সে কে। রবিন্স তাকে নিরীহ বিজ্ঞানী ভাবছে, ভাবুক। সে-ও ভান করে যাবে। সুবিধে হচ্ছে, নিউক্লিয়ার ফিজিক্স সম্বন্ধে ওর নিজের জ্ঞান প্রফেসর সালামের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এমনকি ইদানীং লক্ষ করছে, প্রফেসর সালামের হাতের লেখা হুবহু বেরচ্ছে ওর হাত দিয়ে। ও যে প্রফেসর সালাম নয় তা বোঝে কার সাধ্য।

রিটজ হোটেলে ঢুকল গাড়ি। নেমে এল রানা। হোটেলটা বিলাসবহুল। এখানে এসে আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে গেছে তার। কিন্তু রিসেপশনে গিয়ে জানল রবিন্স মিনিট দশেক আগে হোটেল ছেড়েছে, স্টেশনের উদ্দেশে।

রানা অনুমান করল, বুখারেস্টের ট্রেন ধরতে গেছে

রবিন্স। ওখান থেকে হয়তো জোভোগোরোড যাবে। দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এল ও। ট্যাক্সি থামিয়ে উঠে পড়ল। পাঁচশো ফ্র্যাঙ্ক ধরিয়ে দিল ড্রাইভারের হাতে। সময় মত স্টেশনে পৌঁছে দিতে পারলে আরও পাঁচশো দেবে। হাওয়ায় ভেসে যেন স্টেশনে পৌঁছে গেল গাড়ি। ড্রাইভারকে ভাড়া মিটিয়ে নেমে পড়ল রানা, ছুটছে। ট্রেন চলতে শুরু করেছে ইতোমধ্যে। লাফিয়ে শেষ বগিটায় উঠতে পারল ও।

করিডর ধরে এগোল রানা। চলে এল ফাঁকা একটা কম্পার্টমেন্টে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতেই কাঁধে হাতের স্পর্শ পেল। পাঁই করে ঘুরল ও।

'তো, শেষ পর্যন্ত মত পাল্টালেন, প্রফেসর,' বলল হ্যামণ্ড রবিন্স।

চার

এপ্রিল বিশ

রানার মধ্যে ভাবান্তর লক্ষ করা গেল না।

'আপনাকেই খুঁজছিলাম, মিস্টার রবিন্স। দেখতেই পাচ্ছেন মত বদলেছি।'

নিষ্পলক চেয়ে রইল রবিন্স। তারপর হাতের ইশারায় বসতে বলে চুরুট ধরাল। রানাও পাইপে তামাক ভরল।

'প্রফেসর সালাম,' মৃদু হেসে বলল রবিন্স, 'আমাকে একেবারে অবাক করে দিয়েছেন। নিজের চোখকেই বিশ্বাস হতে চাইছে না। হঠাৎ আপনার সুবুদ্ধির উদয় হলো দেখছি। কি ব্যাপার বলুন তো?'

এমনটিই আশা করেছিল রানা।

'খোলাখুলিই বলছি। আমার দৃষ্টিভঙ্গির কোন পরিবর্তন আসলে হয়নি। ব্যাপারটা অন্যখানে। রিসার্চের জন্যে যে পরিমাণ টাকা প্রয়োজন তা নেই আমার। সেজন্যেই আপনার

প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়াটা সম্ভব হলো না।'

রানার কথা যুক্তিসঙ্গত মনে হলো রবিন্সের। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল সে।

'গুড। লাঞ্চের সময় আলাপ করা যাবে, কি বলেন?'

কন্ট্রাক্টের ব্যাপারে পরে আলাপ হলো ওদের। রবিন্স স্মরণ করিয়ে দিল, গানস অ্যাণ্ড ব্লিসের পক্ষে প্রফেসর যে কাজই করুন না কেন সেটা শুধুমাত্র কোম্পানীর এখতিয়ারভুক্ত। কোম্পানীর কাছে তাঁকে দায়বদ্ধ থাকতে হবে। ছয় মাসের জন্যে কন্ট্রাক্ট করতে চায় রবিন্স। তবে ভিজিলের ফর্মুলা যে দিন কোম্পানীর হস্তগত হবে প্রফেসরের চুক্তি শেষ হয়ে যাবে সেদিনই। সেই বিশেষ দিনটিতে প্রফেসর পুরো পাওনা অর্থাৎ চার লাখ পাউণ্ড পেয়ে যাবেন। অবশ্য চুক্তিবদ্ধ প্রতিটি মাসেই তিনি আরও আশি হাজার পাউণ্ড করে পেতে থাকবেন।

রানা ভেবেছিল আরও অনেক শর্ত জুড়ে দেবে রবিন্স। কিন্তু তেমন কিছুই বলল না ও। খুব কাছ থেকে রানাকে জরিপ করছে রবিন্স। হাসল রানা, খানিকটা বিস্মিত। দ্রুত চিন্তা চলছে মনে, ফর্মুলা হাতিয়ে তারপর বোমা বানিয়ে দেয়ার জন্যে চাপ সৃষ্টি করবে না তো রবিন্স?

'অফারটা লোভনীয়। এখন আপনাকে খুশি করতে পারলে হয়। পারব আশা করি।'

'তবে কথা পাকা হয়ে গেল,' বলল রবিন্স। 'বেল-এ

ঘণ্টাখানেকের জন্যে থামবে ট্রেন। আমাদের অফিস রয়েছে ওখানে। কন্ট্রাক্টটা ওখানেই সেরে ফেলব।'

চওড়া হেসে হাতের গেলাসটা তুলে ধরল রবিন্স।

'আমাদের সাক্সেস কামনা করে...' বাক্যটা সম্পূর্ণ করল না ও। রানার কাঁধের ওপর দিয়ে চেয়ে রয়েছে। চোখ জোড়া সরু। চমকে গেছে মনে হলো।

রেস্টুরেন্ট কারে দুজন আগন্তুক ঢুকেছে। ওরা না বসা তক জরিপ করল রবিন্স। এদের চেনে রানা। লে হাভরে—প্যারিস ট্রেনের সেই দুই যাত্রী।

'কিছু মনে করবেন না, প্রফেসর,' হাতের গেলাসটা উঁচিয়ে বলল রবিন্স। 'ভূত দেখার মত চমকে উঠেছিলাম।'

কম্পার্টমেন্টে ফিরে এল ওরা। একটা রিপোর্ট নিয়ে বসেছে রবিন্স। আর কোন কথা হলো না ওদের মধ্যে। তাতে বরং খুশিই হলো রানা। প্রফেসর সালাম হিসেবে ওর বেশি কথাবার্তা না বলাই ভাল। ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। তাছাড়া এখন মাথা ঠাণ্ডা রাখতে চায় ও, ভাবতে হবে।

প্যারিস ট্রেনের যাত্রী দুজনকে দেখে রবিন্সের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করবার মত। অবশ্য সেরকম আভাস রবিন্স নিজেও দিয়েছে।

কারা ওরা? রবিন্স বলবে না, এটা নিশ্চিত। জানতে হবে রানাকেই।

করিডরে চলে এল ও। কোচের শেষ প্রান্তে হেঁটে গেল, ধীর পায়ে। প্রতিটি কম্পার্টমেন্টের লোকজনের ওপর একবার করে নজর বুলিয়েছে। শেষ পর্যন্ত দেখা পেল ওদের। লোকটিকে দেখে মনে হলো ঘুমাচ্ছে, মেয়েটি পড়ছে কি যেন। আরও খানিকদূর হাঁটল রানা। তারপর থেমে দাঁড়িয়ে জানালা দিয়ে বাইরে চাইল। ভাবছে, কি করা উচিত।

কেমন যেন একটা ধোঁয়ার পর্দা মনের ওপর। আবছাভাবে ভেসে উঠছে কয়েকটা মুখ। সোহানার অনিন্দ্যসুন্দর চেহারা, মেজর জেনারেল রাহাত খানের কাঁচাপাকা ভ্রূ। ওদেরকে আরও স্পষ্টভাবে কল্পনা করার চেষ্টা করল রানা। পারল না। হঠাৎ বাস্তবে ফিরে এল ও।

লম্বা একটা টানেলে ঢুকেছে এখন ট্রেন। আচমকা গতি কমে গেল। রেলের সঙ্গে চাকার ঘর্ষণের জোরাল শব্দ কানে এল। ঝাঁকি মেরে থামল ট্রেনটা। মুহূর্তে একাধিক জানালা খুলে গেল। উঁকি দিচ্ছে অনেকগুলো মাথা। ক'জন অফিসার নেমে পড়ল লাইনের ওপর। একটা কোচের ব্রেক পরীক্ষা করছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সমস্ত যাত্রী, এমনকি ড্রাইভারকেও দেখা গেল লাইনে। প্রত্যেকেই উপদেশ দিচ্ছে।

কৌতুক অনুভব করছে রানা। চেয়ে রয়েছে সে। হঠাৎ কাছেই দরজা খোলার শব্দে চমকে উঠল।

'এক্সকিউজ মি, মঁসিয়ে, কি ব্যাপার বলতে পারেন?' সেই যুবতীর কণ্ঠস্বর। পরিষ্কার ইংরেজিতে প্রশ্নটা করেছে।

'ব্রেকের প্রব্লেম,' জবাব দিল রানা।

লাইনে ভিড় করা জনতার দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চাইল যুবতী।

'আপনার কি মনে হয়, অনেক দেরি হবে?'

'মনে হয় না, ম্যাডাম। ব্রেকটা বোধহয় কাজ করতে শুরু করেছে।'

মহিলার চেহারায় স্বস্তি ফুটল। আরও সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে এ মুহূর্তে। হঠাৎ হুইসেলের শব্দ। প্যাসেঞ্জাররা তড়িঘড়ি করে উঠতে লাগল ট্রেনে।

'আমি আপনার ভক্ত, প্রফেসর,' হঠাৎ বলল মেয়েটি। 'আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করি আমি।'

'ও, আচ্ছা,' খানিকটা থতমত খেয়ে গেছে রানা। 'কিন্তু আমাকে চিনলেন কিভাবে?'

'কে না চেনে আপনাকে বলুন।'

মুচকি হাসল রানা।

'আপনিও কি বুখারেস্ট যাচ্ছেন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল মহিলা। 'তবে থাকব না ওখানে।' মৃদু হাসল সে।

'আমিও বুখারেস্ট ক্রস করব,' বলল রানা। 'জোভোগোরোড যাচ্ছি।'

মহিলার মুখের সূক্ষ্ম পরিবর্তনটা দৃষ্টি এড়াল না রানার।

নরম গলায় বলল মহিলা, 'ও, তাই নাকি?'

'জোভোগোরোড জায়গাটা কেমন? গেছেন আগে কখনও?'

'গেছি।' মহিলার চোখ এখন সোজাসুজি রানার চোখে। 'গবেষণার কাজে যাচ্ছেন?'

'উঁহুঁ। বলতে পারেন শখের জন্যে—ফটোগ্রাফী। শুনেছি জোভোগোরোডের কাছে নাকি দারুণ কয়েকটা স্পট আছে।'

রানা অনুভব করছে, মহিলা সন্দেহ করতে শুরু করেছে তাকে।

'ঠিকই শুনেছেন,' বলল মহিলা। 'তবে আপনাকে একটা সাজেশন দিই। প্ল্যান চেঞ্জ করুন। ইক্সানিয়ায় আরও কিছুদিন পরে আসুন, আমরা আপনাকে ভিআইপি. অভ্যর্থনা জানাব। তাছাড়া বসন্ত কালটায় ওখানে অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকে।'

মহিলার চোখ দুটো আচমকাই শীতল হয়ে গেছে। রানা স্পষ্ট বুঝল, ভদ্র ভাষায় সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে তাকে। এ-ও বুঝল মহিলা ইক্সানিয়া সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কেউ।

কিছু একটা বলার জন্যে মুখ খুলতেই বাধা পেল রানা। তীক্ষ্ণ স্বরে কথা বলে উঠেছে মহিলা।

'মঁসিয়ে, বেল-এ কখন পৌঁছব বলতে পারেন?'

'সাড়ে আটটায়, ম্যাডাম।'

'ধন্যবাদ, মঁসিয়ে।'

ভুবনমোহিনী হেসে উল্টো দিকে ঘুরল মহিলা। দরজা

বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে গেল। চোখের কোণে কারণটা ধরা পড়ল রানার।

করিডরের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে হ্যামণ্ড রবিন্স। দৃষ্টি এদিকে।

পাঁচ

এপ্রিল বিশ

মহিলার উপস্থিতিতে স্পষ্টতই বিরক্ত হয়েছে রবিন্স। পরে, কম্পার্টমেন্টে ফেরার পথে রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'চেনেন মহিলাকে?'

অবাক হলো যেন রানা।

'আরে না। কোত্থেকে উড়ে এসে রাজ্যের প্রশ্ন শুরু করল। ট্রেন কখন ছাড়বে, কখন বেলে পৌঁছবে—হ্যানো ত্যানো।'

'আর কিছু আলাপ হয়নি?'

'আমাকে চিনে ফেলেছে। জানতে চাইছিল কোথায় যাচ্ছি।'

'বলেছেন?' উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে রবিন্সকে।

'হ্যাঁ।'

খুশি হতে পারল না রবিন্স। রানার 'শখ' এর কথা শুনে উপদেশ দিল—বেলে পৌঁছেই ক্যামেরা কেনার জন্যে। কারণ

যদ্দূর সম্ভব ইক্সানিয়ার বর্ডারে আঁতিপাতি করে খোঁজা হবে জিনিসটা। সে সত্যি বলেছে কিনা নিশ্চিত হতে চাইবে।

'খুব কড়াকড়ি নাকি?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ, খুবই,' বলল রবিন্স। ইক্সানিয়ার সাম্প্রতিক অতীতের ঘটনাগুলো সম্বন্ধে রানাকে একটা স্বচ্ছ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করল ও। জানাল, দেশটি প্রেসিডেন্ট শাসিত একটি রিপাবলিক। কিন্তু মূল ক্ষমতা বাছাই করা কজন মানুষের হাতে সীমিত।

'ওরা ইক্সানিয়ার প্রতি অসম্ভব বিশ্বস্ত,' জানাল রবিন্স। 'বোকাও বটে—একজন ছাড়া। বলা যায়, সে-ই ইক্সানিয়াকে চালাচ্ছে। মহিলার নাম কাউন্টেস ক্যারেনিনা। অদ্ভুত মানুষ, প্রফেসর, অসম্ভব বুদ্ধিমতীও। ইউরোপে তার সমকক্ষ পলিটিশিয়ান খুব বেশি নেই।'

'দুর্ভাগ্য হচ্ছে,' বলে চলল রবিন্স, 'মহিলার সঙ্গে ব্যবসার কাজে পরিচয় হয়েছিল আমার। ইক্সানিয়ার সরকার জোভোগোরোডে আমার উপস্থিতি ভাল চোখে দেখবে না। ভেবেছিলাম সবার অজান্তে ইক্সানিয়ায় ঢুকে পড়ব। কিন্তু কাউন্টেস লণ্ডনের সেই প্রতিনিধিকে নিয়ে জোভোগোরোড ফিরছে। আমাকে দেখেই চিনে ফেলেছে। মহিলা বড্ড ধুরন্ধর। ভান করছে, যেন চেনে নি।'

'তো?'

'আপনি যার সঙ্গে কথা বলছিলেন সেই মহিলাই

কাউন্টেস ক্যারেনিনা। অসুবিধা হচ্ছে,' বলল রবিন্স, 'আমাদের ওপর কড়া নজর রাখা হবে। ভিজিলের গোপন তথ্য আদায় করতে বারোটা বেজে যাবে। কাউন্টেস যখন চিনেই ফেলেছে আপনাকে তখন এটা রাখুন,' কোটের ভেতর থেকে একটা ওয়ালথার পি. পি. কে আর পঞ্চাশ বুলেটের একটা প্যাকেট বার করে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল রবিন্স।

'অন্য রাস্তা ধরতে হবে আমাদের।'

খুশি হয়ে উঠল রানা। হাসল মনে মনে। 'ব্যাটা যদি জানত মাসুদ রানা তার প্রিয় অস্ত্র পেয়ে গেছে হাতে,' ভাবল ও।

'কি সেটা?' রবিন্সের কথার প্রত্যুত্তরে বলল রানা।

'ইক্সানিয়ার অফিশিয়ালদের হাত করতে হবে। সেজন্যে চাই বিশাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট।'

স্মিত হেসে কতগুলো কাগজ পত্র খুঁটিয়ে পড়তে শুরু করল রবিন্স।

বেল-এ ঘণ্টা কয়েকের যাত্রাবিরতি। এখান থেকে বুখারেস্টের পথে রওনা দেবে আবার। গানস অ্যাণ্ড ব্লিসের অফিসে চলে গেল রবিন্স, প্রফেসরের কন্ট্রাক্টের ব্যবস্থা করতে।

রানা ওদিকে কাপড়-চোপড়, স্যুটকেস, ক্যামেরা আর টুকিটাকি কিছু জিনিস কিনে নিল। রবিন্স তাকে পঞ্চাশ হাজার ফ্র্যাঙ্ক দিয়ে গেছে।

ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা খানেক আগে ক্যাফেতে ঢুকল রানা। কফির অর্ডার দিল। একটা সুইস খবরের কাগজের ছোট্ট একটা হেডলাইন দৃষ্টি কাড়ল ওর ঃ

প্রফেসর সালামের রহস্যময় অন্তর্ধান

'অন্তর্ধান না আরও কিছু!' আপন মনে বলল রানা। 'প্রফেসর আমাকে এ কাজে পাঠিয়েছেন মানব জাতিকে রক্ষা করার জন্যে। নিজের জামা কাপড় এমনকি পাসপোর্টটা পর্যন্ত দিয়েছেন। যে করে হোক তাঁর মুখ রক্ষা করতেই হবে। অবশ্য প্রফেসর কদিন ঘাপটি মেরে থাকতে পারবেন কে জানে।'

আরও খানিক দূর পড়ল রানা। তবে পুরোটা পড়ার আগেই চোখ চলে গেল বাইরে। রাস্তার উল্টো দিকে রবিন্স, একটা ট্যাক্সি থেকে নামছে।

তক্ষুণি বিল মিটিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এল রানা। স্যুটকেসটা নিয়ে পিছু নিল রবিন্সের। একটা দুর্গন্ধযুক্ত, অন্ধকার প্যাসেজে না ঢোকা তক রবিন্সকে অনুসরণ করল ও। পুরানো একটা বাড়িতে গিয়ে সেঁধিয়েছে রবিন্স। রানার মনে হলো বাড়িটা যেন ফাঁকা। দরজার ছায়ায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্য রাখছে রানা। খানিক পরে দুজন লোককে বেরোতে দেখা গেল। রানাকে দেখেনি। পাশ কাটিয়ে চলে গেছে।

একজন রবিন্স, অন্য লোকটিকে তাৎক্ষণিকভাবে চিনল

না রানা। এ সময় জ্বলে উঠল প্যাসেজের শেষ কোণের ল্যাম্প। এবার চিনল রানা। কাউন্টেসের সঙ্গে ট্রেনে দেখেছিল একে।

ওদের কথা খুব সামান্যই কানে এল ওর। ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা হচ্ছে। রবিন্সকে কথা বলতে শুনল।

'বুঝেছেন এবার? বাকিটা প্যারিসে, আপনার সুইস ব্যাঙ্কে চলে যাবে। এখন শুধু আমাদের টেকনিকাল অ্যাডভাইজার ইনফর্মেশনগুলো অ্যাপ্রুভ করলেই হলো।'

তারমানে ঘুষ!

আর অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। বাড়িটিতে তল্লাশি চালানো অনর্থক। যা জানার জানা হয়ে গেছে রানার। স্টেশনে ফিরল ও।

কম্পার্টমেন্টে ঢুকে দেখতে পেল গানস অ্যাণ্ড ব্লিসের প্রতিনিধি বসে রয়েছে। খুশি খুশি দেখাচ্ছে তাকে।

ছয়

এপ্রিল একুশ—তেইশ

পরবর্তী আটত্রিশ ঘণ্টা বিনা ঘটনায় কেটে গেল। বুখারেস্টে সন্ধের আগ দিয়ে পৌঁছল ওরা। এক ঘণ্টা পরে অন্য ট্রেন ধরে জোভোগোরোড রওনা হলো। কম্পার্টমেন্টটা নোংরা, তাছাড়া আরামদায়কও নয়। যাত্রাটা সুখকর হবে না খুব একটা, বুঝল রানা।

কাউন্টেস আর তার সঙ্গী অর্থাৎ মিনস্কিকে পরের বগিটায় পাওয়া গেল। আর্মির পোশাক পরা আরও দুজন গুঁফো লোকও রয়েছে সেখানে। রানা লক্ষ করল, দুজনের কারও সঙ্গেই লাগেজ নেই। এছাড়া কামরায় বেশ কিছু গ্রাম্য লোকজন দেখতে পেল ও। পরিবার পরিজন নিয়ে চলেছে তারা।

রবিন্সকে খুব আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে। জানিয়েছে, ইক্সানিয়ায় কাজ সারতে দেরি হওয়ার কথা নয়। দু-তিন

দিনের মধ্যেই প্রয়োজনীয় তথ্য হাতে চলে আসবে বলে আশা তার।

রানা বুঝে পেল না, কেন তবে ছ মাসের জন্যে কন্ট্রাক্ট করা হয়েছে তাকে।

রাত দুটোয় ইক্সানিয়ার সীমান্তে পৌঁছল ওরা। স্টেশন প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল রানা। তীব্র শীত। গা গরম করার জন্যে পায়চারি শুরু করল ও। কিছুক্ষণ পরেই একজন সঙ্গী জুটে গেল। লম্বা মত এক আমেরিকান যুবক। উলোঝুলো অবস্থা।

'কেমন আছেন, প্রফেসর?' জিজ্ঞেস করল যুবক।

অবাক হয়ে গেল রানা। কোনদিন দেখেনি একে।

'অবাক হয়েছেন না?' প্রশ্ন করল যুবক, 'আমি আমেরিকার ট্রিবিউন পত্রিকার সাংবাদিক। কদিন আগেই আপনার একটা আর্টিকেল ছেপেছি আমরা।'

উভয় সঙ্কটে পড়েছে রানা। স্বীকার বা অস্বীকার কোনটাই করতে পারছে না। তাছাড়া রবিন্স কাছেপিঠেই রয়েছে। সে রানার আসল পরিচয় জেনে ফেললে বিপদ। রানা আরেকবার বুঝল, প্রফেসর ভদ্রলোক খুবই পরিচিত। রবিন্স এবং অন্যান্য যাত্রীরাও নেমে এল এসময়। মৃদু হেসে পরিস্থিতি সামাল দিতে চাইল রানা। বড়সড় এক কুঁড়েতে শীত-কাতর মানুষগুলোকে নিয়ে যাওয়া হলো। মিনস্কিকে দেখতে পেল রানা। কিন্তু কাউন্টেস নেই। খানিকটা হতাশ

হলো সে। হঠাৎ একটা মার্সিডিজে উঠতে দেখা গেল কাউন্টেসকে। দ্রুত ছুটল গাড়িটা। বোধহয় তাড়া আছে মহিলার।

পাসপোর্ট পরীক্ষা করার পর কাস্টমস অফিসাররা যাত্রীদের লাগেজ হাতড়াতে শুরু করল।

রানার ক্যামেরাটা নিয়ে নিল তারা। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পেছনের পকেটে রাখা পিস্তলটার খোঁজ পেল না।

ট্রেন স্টেশন ছাড়তেই সশব্দে হেসে উঠল রবিন্স।

'প্রফেসর', আমুদে গলায় বলল ও, 'কাউন্টেস ক্যারেনিনার ভাবসাব সুবিধের ঠেকছে না। আমার তো ধারণা ও আপনার প্রেমে পড়ে গেছে।'

মৃদু হাসল রানা।

'ক্যামেরাটা ভাল জাতের ছিল,' বলল ও, 'ইচ্ছে ছিল জোভোগোরোডের কিছু ছবি তুলব। হলো না। আবার আরেকটা কিনতে হবে।'

পকেট থেকে ঠিক আগেরটার মত দেখতে একটা ক্যামেরা বার করে দিল রবিন্স।

'এটা রাখুন, কাজে দেবে। জানতাম আপনার ক্যামেরাটা কেড়ে নেবে, তাই আমিও একটা কিনে রেখেছিলাম। এখন যত খুশি ছবি তুলবেন।'

ওভারকোটটা টেনে-টুনে আরাম করে বসল রবিন্স। ঘুমিয়ে পড়তেও সময় লাগল না ওর।

রানারও চোখ বুজে এল। ঘুমাল খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎই চমকে জেগে উঠল। কোথাও কোন গণ্ডগোল হয়েছে। ট্রেন তখন পক্ষীরাজের মত ছুটে চলেছে। পুবাকাশে একবার বিদ্যুৎ চমকাল। এ সময় করিডরের অন্য প্রান্ত থেকে শব্দ এল। গুলি, কোন সন্দেহ নেই। মুহূর্ত পরে আরও দুবার।

সময় নষ্ট না করে করিডরে চলে এল রানা। অন্ধকার, ভাল করে ঠাহর করা যায় না। দুটো আবছা শরীরকে করিডর ধরে এগোতে দেখল ও। উত্তেজিত কণ্ঠের কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। গুলির শব্দ অন্যরাও শুনেছে। আচমকা ব্রেক চাপার তীক্ষ্ণ শব্দ। সামনের দিকে হুমড়ি খেতে গিয়ে সামলে নিল রানা। থেমে গেছে ট্রেন। কে যেন অ্যালার্ম বাজিয়েছে। রানার সামনে তিনটে ফাঁকা কামরা। ট্রেন থামতেই একটার বাইরের দিকের দরজা খুলে গেল। চোখের পলকে পরবর্তী কামরায় পা রাখল রানা। ঝুঁকে পড়ল জানালা দিয়ে। দুটো ছায়ামূর্তি দ্রুত পায়ে মাঠ পেরোচ্ছে।

করিডরে ফিরে এল রানা। টর্চ হাতে এক গার্ড এদিকেই আসছে। রবিন্সও বেরিয়ে এসেছে। তাকে সব কথা খুলে বলল রানা।

গার্ড উঁকি দিচ্ছে প্রতিটা কামরাতে। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে। তার পেছনে জুটে গেল যাত্রীদের অনেকে, ঠেলে জায়গা করে নিয়ে এগোল রবিন্স। পৌঁছেছে গার্ডের কাছে। টর্চটা উঁচিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে গার্ড। চোখ দুটো বিস্ফারিত, মুখ

হাঁ।

একটা লোকের শরীর। অর্ধেকটা সীটে, বাকিটা মেঝেতে। কপালের ক্ষত থেকে রক্ত গড়িয়ে নামছে। দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। আতঙ্কিত চাহনি, বিকৃত দেখাচ্ছে মুখ। তবে তাকে চেনা যাচ্ছে পরিষ্কার। মিনস্কি।

রবিন্সের সঙ্গে কম্পার্টমেন্টে ফিরে এল রানা। জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত রবিন্সের। মুখে কথা নেই। মনে মনে লোকটির প্রশংসা করল রানা, নিজের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পেরেছে। তাকে অস্ফুটে কি যেন একবার বলেই বসে পড়ল সীটে।

'প্রফেসর,' তিক্ত শোনাচ্ছে রবিন্সের কণ্ঠ, 'আমি ভুল বলেছিলাম। জোভোগোরোডে আসলে আমাদের বেশ কিছুদিন থাকতে হবে।'

ওভারকোটটা ভাল করে গায়ে জড়াল রবিন্স, তারপর আবার ঘুমের অতলে ডুব দিল। ট্রেনের অফিসাররা তখন প্রশ্ন করছে যাত্রীদের। রানা মুখ বন্ধ রাখল। জানাল, কিছুই দেখেনি সে। তবে, সৌভাগ্যক্রমে অন্য একজন যাত্রী পালাতে দেখেছে দুটো লোককে। ভাল করে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, দুই গুঁফো মিলিটারি গায়েব।

এ ঘটনার ফলে বেশ কিছু ব্যাপার খোলাসা হয়ে গেল রানার কাছে। গানস অ্যাণ্ড ব্লিসের সঙ্গে মিনস্কির যোগাযোগের খবর গোপন থাকেনি। কাউন্টেস ক্যারেনিনা

মিনস্কির সহযাত্রী হয়েছিল দুটো কারণে; সে চেয়েছিল রবিন্সের সঙ্গে যাতে মিনস্কির আর যোগাযোগ না হয়। তাছাড়া মিনস্কির সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য সেরা জায়গা নিঃসন্দেহে ইক্সানিয়া। মিনস্কির হত্যাকারীরা বুখারেস্টে উঠেছিল, ট্রেনে। খুনীদের দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে সীমান্তে নেমে গেছে কাউন্টেস।

'বেশি জেনে ফেলেছিল বেচারা,' পরে রানার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে বলল রবিন্স।

রানার মৃত্যুও কি এমন আচমকাই আসবে?

রবিন্সের ঠোঁটে ঠাণ্ডা হাসি। তবে চোখ দুটোয় তার লেশমাত্র নেই। অস্বস্তি বোধ করছে রানা।

সাত

এপ্রিল তেইশ—মে আট

তিনটে উপত্যকার মাঝখানে জোভোগোরোড শহরটা। পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় ঠাণ্ডা কমই এখানে। ইক্সানিয়া মোটামুটি সচ্ছল দেশ।

হোটেল কন্টিনেন্টালে উঠেছে রানারা। খাওয়ার সময় কথা হয় রবিন্সের সঙ্গে, অন্য সময় তার দেখা পাওয়া ভার। এ হোটেলটা রবিন্সের বেছে নেয়ার কারণ রয়েছে। শহরের ঠিক কেন্দ্রস্থলে এটার অবস্থান। সেরা ঘরগুলো নিয়ে রাজার হালে নিজেকে রেখেছে রবিন্স। রানা অবশ্য সাধারণ মানের একটা বেডরূম পেয়েছে, করিডরের উল্টো দিকটাতে।

পৌঁছেই রানাকে জানিয়ে দিয়েছে রবিন্স, চট করে তাকে দরকার পড়বে না। ফলে রানা এখন ঝাড়া হাত পা।

রবিন্সের সীটিং রূমে ইতোমধ্যেই সন্দেহজনক বেশ কিছু লোকজনের আনাগোনা শুরু হয়ে গেছে। রানার ধারণা, এরা

গানস অ্যাণ্ড ব্রিসের স্থানীয় এজেন্ট।

রানার হাতে এখন সময় আছে। ফলে ক্যামেরা নিয়ে শহর ঘুরে বেড়ায় সে। ইচ্ছে হলে ছবি তোলে দু একটা। আসলে পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে জেনে নেয়ার চেষ্টা করছে। বেশির ভাগ সময় কাটে তার কুডবেকের একটা ক্যাফেতে। একটা ইস্পানিয়ান-ফ্রেঞ্চ ডিকশনারীর সাহায্যে জোভোগোরোড়ের নামকরা দৈনিকগুলো পড়ার চেষ্টা করে ও।

জোভোগোরোড়ে পৌঁছনোর দু সপ্তাহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে শ্রমিক অসন্তোষ। 'ইয়াং ওয়ার্কার্স পার্টি' সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করেছিল। তবে পুলিসী তৎপরতার কারণে তাদের কর্মসূচী সফল হয়নি।

পনেরোতম দিনে ক্যাফেতে বসে বসে বিরক্ত বোধ করছিল রানা। এখন পর্যন্ত কিছুই জানতে পারেনি সে, পারবে এমন আশাও করতে পারছে না। ভিজিলের ল্যাবোরেটরী কোথায় জানা সম্ভব হয়নি এখনও।

ঠিক এ সময় কে যেন পেছন থেকে নাম ধরে ডাকল। ঘাড় ফিরিয়ে ট্রেনের সেই আমেরিকানটিকে দেখতে পেল ও।

'চিনেছেন? আমি লিনফোর্ড—হেনরী লিনফোর্ড। ট্রিবিউন পত্রিকার রিপোর্টার,' চেয়ারে বসে পড়ে বলল ও।

'কেমন আছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

ড্রিংকের অর্ডার দিল লিনফোর্ড।

'মিনস্কির ব্যাপারে খুব কৌতূহল বোধ করছি,' বলল লিনফোর্ড। 'চেনেন তাকে?'

মাথা নাড়ল রানা। লিনফোর্ড সিগারেট রোল করল।

ড্রিংক চলে এল। রানার জন্যে কফি।

'কাউন্টেস ক্যারেনিনাকে চেনেন নাকি?' প্রশ্ন ছুঁড়ল লিনফোর্ড।

কফিতে চুমুক দিল রানা। 'চেনা তো দূরের কথা নামও শুনিনি।'

'প্যারিস পেরনোর পর কথা বলতে দেখেছি আপনাদের।'

'তাই নাকি? ট্রেনে তো কত মানুষের সঙ্গেই পরিচয় হয়, হয় না?'

হাসল লিনফোর্ড।

'তা হয়, প্রফেসর। এখানে ছুটি কাটাতে এসেছেন বোধহয়?'

'হ্যাঁ।'

'কি কাণ্ড দেখুন দেখি,' অসহিষ্ণু গলায় বলল সাংবাদিক। 'এখানে পৌঁছতে না পৌঁছতেই খবর। মারা পড়ল মিনস্কি। সরকার খুনীদের বিরুদ্ধে কোন অ্যাকশন নিতে পারল না। আরও একটা খবর আছে। আর্মস কোম্পানীর এক বস্—হ্যামণ্ড রবিন্স নাম, লোকাল বন্দুকবাজদের সঙ্গে হোটেলে মীটিং করছে। আর সেই রবিন্সকে সহায়তা করছেন বিখ্যাত এক বিজ্ঞানী। কিন্তু কেন?'

'আর কি জানেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'এর বেশি কিছু না,' দ্রুত জবাব এল।

নিজের অবস্থানটা একবার ভেবে নিল রানা। ইনফর্মেশন আছে লিনফোর্ডের কাছে, কাজে লাগবে ওকে। এ সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করা চলবে না।

'আরেকটা ড্রিংক নেবেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। সায় জানাল লিনফোর্ড। পাইপ ধরাল রানা।

'এখন বলুন,' ভারি গলায় বলল রানা। 'কি জানতে চান?'

ঝুঁকে পড়ল লিনফোর্ড।

'প্রথম কথা হচ্ছে,' ফস করে বলে ফেলল লিনফোর্ড। 'মিনস্কিকে মারা হলো কেন? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন : গানস অ্যাণ্ড ব্লিস জোভোগোরোডে কি চায়?'

নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল রানা।

'প্রথমটার উত্তর দিতে পারব না। কারণ উত্তরটা আমি নিজেও জানি না। দ্বিতীয়টার জবাব দিচ্ছি। তবে কথাটা গোপন রাখতে হবে কিন্তু। গানস অ্যাণ্ড ব্লিস ইক্সানিয়ার গভর্নমেন্টের কাছে আর্মি গান বিক্রি করছে। এ ব্যাপারে আমি ওদের উপদেষ্টা।'

কঠিন হলো লিনফোর্ডের দৃষ্টি। পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক তাড়া কাগজ বার করল সে। বেছে নিল একটি।

'আপনার রেকর্ড, প্রফেসর,' ছোট্ট করে বলল লিনফোর্ড।

'সপ্তাহ খানেক আগে নিউ ইয়র্ক থেকে আনিয়েছি।'

প্রফেসর সালামের কাজ এবং লেখালেখির রেকর্ড দেখিয়ে দিল সে।

'নিউক্লিয়ার, প্রফেসর, নিউক্লিয়ার।'

হেসে ফেলল রানা।

'আপনি নাছোড়বান্দা লোক দেখছি।'

'ঠিকই বলেছেন। নাছোড়বান্দা না হলে রিপোর্টারদের ভাত নেই। গানস অ্যাণ্ড ব্লিসের আর্মি গান উপদেষ্টা হচ্ছেন মেজর জেনারেল কেনেথ রবসন—আপনি নন।'

'আপনি আসলে ভুল করছেন...'

উঠে পড়ল লিনফোর্ড। কণ্ঠে রাগ।

'সত্য গোপন থাকে না, প্রফেসর। আমাকে বোকা বানানো অত সহজ নয়। আবার দেখা হবে। আসি।'

ঘুরে হেঁটে চলে গেল সে।

রানা যখন ফিরল তখন ডিনার সারছে রবিন্স। খোশ মেজাজে রয়েছে সে। জানাল, শীঘ্রিই রানার সাহায্য দরকার পড়বে।

'বেশ কিছু লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে,' বলল রবিন্স। 'কাজের লোক। দু তিন দিন অপেক্ষা করতে হবে; তারপরই বোঝা যাবে কাজ কদ্দূর এগিয়েছে।'

সে-সন্ধ্যায় রানাকে অপেরায় আমন্ত্রণ জানাল রবিন্স। ট্যাক্সিতে করে অপেরায় রওনা হওয়ার মুহূর্তে ড্রাইভারকে

স্টার্ট বন্ধ করতে বলল রবিন্স। রানার দিকে ফিরল।

'"বডি গার্ড"রাও আসুক আমাদের সঙ্গে, কি বলেন?'

মৃদু হেসে ফুটপাতের দিকে ইশারা করল ও। দুজন লোক মরিয়া হয়ে একটা ট্যাক্সি থামানোর চেষ্টা করছে।

'কাউন্টেস কোন ঝুঁকি নিতে রাজি না। ফেউ লাগিয়ে দিয়েছে পেছনে।'

'বডি গার্ড দুজন ট্যাক্সিতে চাপলে ড্রাইভারের উদ্দেশে মাথা নাড়ল রবিন্স। চালু হলো গাড়ি।

ওরা পৌঁছনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম অঙ্ক শেষ হলো। বিরতির সময় কাউন্টেস ক্যারেনিনার দিকে ভ্রূ উঁচিয়ে দেখাল রবিন্স। আবারও মুগ্ধ হলো রানা। অনেকে কাউন্টেসের বক্সে গিয়ে দেখা করছে, কথা বলে আসছে। মিনস্কির খুনের সঙ্গে এই সুন্দরী মহিলাকে মন থেকে কিছুতেই জড়াতে পারছে না রানা।

অপেরা শেষে গায়ক গায়িকারা মঞ্চে এল। তাদেরকে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে দর্শকরা। হাততালির শব্দ মিলিয়ে গেলে হাত তুলল কণ্ডাকটর। ড্রামে বাড়ি পড়ল। দাঁড়িয়ে গেল দর্শকবৃন্দ। ইক্সানিয়ার জাতীয় সঙ্গীত বাজিয়ে শোনানো হচ্ছে। ঠিক সে মুহূর্তে অপেরা হাউজের প্রতিটা বাতি দু এক সেকেণ্ডের জন্যে কেঁপে উঠল। আলো বেড়ে গেছে। তারপর গাঢ় অন্ধকার। লোড শেডিং।

আট

মে আট

পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে উঠেও অপেরা হাউজের ঘটনাটা মন থেকে তাড়াতে পারল না রানা। বাতিগুলো নিভে যাওয়ার আগে কাঁপল কেন? রহস্যজনক! ইলেকট্রিকের বাতি নিভলে সাধারণত একবারেই নেভে, কেঁপে ওঠে না।

ওয়েটারকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল রানা, মাস দুয়েক আগে ঠিক এমনই একটি লোডশেডিং-এ পুরো শহর অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল।

অদ্ভুত একটা চিন্তা এল রানার মাথায়। হ্যাঁ, অদ্ভুতই, তবে অসম্ভব নয়। লাফ দিয়ে উঠে পড়ল ও। মুখ ধুয়ে বাথরুম সারল। তারপর নাস্তা খেয়ে বেরিয়ে পড়ল ট্যাক্সি নিয়ে। গন্তব্য ন্যাশনাল লাইব্রেরী। 'এনসাইক্লোপিডিয়া ইউনিভার্সেলিয়া'-র কপি চাইল ও। আছে। ইংরেজি সংস্করণই পেয়ে গেল।

কোথায় খুঁজতে হবে জানে রানা। গতকাল লিনফোর্ডই বলে দিয়েছিল সেটা। 'স্ট্রাকচার অভ নিউক্লিয়ারস'-এর চ্যাপ্টারটা খুলল ও। প্রফেসর সালামের লেখা আর্টিকেল থেকে জেনে নিল প্রয়োজনীয় তথ্য। তারপর সশব্দে বইটা বন্ধ করে বেরিয়ে পড়ল।

জোভোগোরেডে আর এর আশেপাশের অঞ্চলগুলোর একটা ম্যাপ কিনতে হবে। কিনল ও। তারপর ওটা বগলদাবা করে পাবলিক গার্ডেনে চলে এল। এক কোণে খালি একটি বেঞ্চি দেখে বসে পড়ল। দেখতে পেল কালকের এক বডি গার্ড বসে রয়েছে কাছেই। খুব সম্ভব একে বলা হয়েছে একাই যাতে সে রানাকে নজরবন্দী রাখে। অন্য লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না। তারমানে গত দু সপ্তাহ ধরেই নজর রাখা হচ্ছে তার ওপর। ব্যাপারটা আজ পরিষ্কার হলো তার কাছে।

ম্যাপটা খুলল রানা। জোভোগোরোডের ইলেকট্রিক সাপ্লাই স্টেশন শহরের উত্তর পুব কোণে। হেলান দিয়ে বসে প্রফেসর সালামের আর্টিকেলটার কথা ভাবল ও। পুরো জোভোগোরোডেই লোড় শেডিং হয়েছে। তারমানে, আলো বেড়ে ওঠার ব্যাপারটা ঘটেছে সাপ্লাই স্টেশন আর উপত্যকার ওপরকার পাওয়ার স্টেশনের মাঝামাঝি কোন জায়গা থেকে। উৎসটার সঠিক অবস্থান জানতে পারলেই বেরিয়ে পড়বে ভিজিলের ল্যাবোরেটরী।

পরিকল্পনা তৈরি করে নিল রানা। জোভোগোরোডে

বিদ্যুৎ আসে ওভারহেড লাইন দিয়ে। সেগুলোর সঙ্গে কোথাও নিশ্চয়ই একটা মেইন কেবল রয়েছে, যেটা চলে গেছে ল্যাবোরেটরীতে। লাইনগুলো ধরে সেখানে পৌঁছে যাবে রানা। কাজ শুরু করতে হবে সাপ্লাই স্টেশন থেকে।

এ মুহূর্তে প্রথম কাজ হচ্ছে টিকটিকিটাকে খসানো। সেজন্যে অবশ্য বিশেষ বেগ পেতে হলো না, কুডবেকের কাছে অলিগলির অন্ত নেই।

ওখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সাপ্লাই স্টেশনের দিকে রওনা দিল ও। রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা পাহাড়ের ওপর স্টেশনটা। চারপাশে তারের বেড়া। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে ওপর দিকে কিছুটা উঠে এল রানা। ওভারহেড লাইনগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এগুলোকে অনুসরণ করতে হবে।

সঙ্গে খাবার নিয়ে নেয়া দরকার। নেমে এল রানা। শহর থেকে বিস্কুটের প্যাকেট আর পানির বোতল নিয়ে যাত্রা শুরু করল আবার।

পাহাড়ে উঠতে প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে। মাটি আলগা, খসে খসে পড়ছে। তাছাড়া খাবার আর পানীয়ের ব্যাগটাও কঠিন করে দিচ্ছে কাজটা। ঘণ্টা খানেক বাদে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থামল ও। খেয়েও নিল সে ফাঁকে। তারপর পূর্ণোদ্যমে যাত্রা শুরু করল। লাইনগুলোর ওপর দৃষ্টি রেখেছে ও। একটা পরিত্যক্ত খনি চোখে পড়ল। ওটার পাশ দিয়ে চলে গেছে রাস্তা। গাছপালার ভেতর দিয়ে চাইল রানা। বুঝল, অভিযান

শেষ। পাওয়ার স্টেশনের লাইনগুলো থেকে দুটো ভারি কেবল চলে গেছে পাহাড়ের ঢালে। জায়গাটা গাছপালা দিয়ে ছাওয়া। উঁচু একটা বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে নিচে।

বিল্ডিংটার এক প্রান্তে চৌকো একটা টাওয়ার। কেবল দুটো ওখানেই পৌঁছেছে। এরকম বিল্ডিং আগেও দেখেছে রানা। ফলে অনুমানে বুঝতে পারল ওটা একটা হাই ভোল্টেজ ল্যাবোরেটরী। কাছ থেকে দেখা দরকার। কিন্তু প্রতিবন্ধক হচ্ছে তারের বেড়া। একটা মরা পাখিকে তারে লটকে থাকতে দেখে, থমকে দাঁড়াল রানা। বেড়াটা ইলেকট্রিফায়েড। এখন বিদ্যুৎ চালু আছে কিনা জানার জন্যে হাত থেকে ঘড়িটা খুলল ও। সামান্য দূরে পড়ে থাকা একটা ডাল কুড়িয়ে নিল। ওটার মাথাটা গুলতির মত। ওখানটাতে ঘড়িটা আটকে তারে ছোঁয়াল ও। কিছুই ঘটল না। কারেন্ট অফ। পরমুহূর্তে বেড়ার ওপাশে পৌঁছে গেল রানা।

গাছপালার ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে রাস্তা। বিল্ডিংটার নিচ দিকে সহজেই চলে এল রানা, কেউ দেখতে পায়নি। দেয়ালের পাশে হামাগুড়ি দিয়ে একটা জানালার নিচে চলে এল ও। চাইল ভেতরে। নানা রকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি রয়েছে ঘরটিতে। ল্যাবোরেটরীর ভেতরে ঢোকার পথ যখন খুঁজছে তখন নিচে উপত্যকার কাছে গাড়ির শব্দ শুনতে পেল রানা। গাড়িটা থেমেছে। এবার দেয়ালের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিল ও। অপেক্ষা করছে।

খানিকক্ষণ পরেই ইলেকট্রিক বেল বেজে উঠতে শুনল। মাথাটা সাবধানে জাগাল রানা। এক লোক ঘরে ঢুকে দরজাটা ধরে রেখেছে। আরেকজনও ঢুকল এবার। তার আগেই মাথা নামিয়েছে রানা, তবে আন্দাজ করতে পেরেছে দ্বিতীয়জন কে হতে পারে। কাউন্টেস ক্যারেনিনা।

লোকটা কথা বলছে, তার কণ্ঠের মাধুর্যে ইক্সানিয়ার ভজঘট ভাষাও চমৎকার শোনাচ্ছে। মাথাটা সামান্য তুলল রানা, লোকটিকে দেখার জন্যে।

খাটো, সরু কাঁধের লোকটির বড়সড় মাথাটায় পাতলা কালো চুল। চেহারায় রাজ্যের বিরক্তি। পরনে সাদা ডাস্ট কোট। এ লোকই খুব সম্ভব ভিজিল।

কাউন্টেস এ মুহূর্তে ফরাসি ভাষায় কথা বলছে। কারণ একজন শ্রমিক ঢুকেছে ঘরে, রানার সুবিধেই হলো তাতে।

'আরও সতর্ক থাকবেন,' বলছে কাউন্টেস। 'অপেরা চলার সময় লাইট চলে গেলে কেলেঙ্কারী হয়ে যেত। প্রেসিডেন্ট অবশ্য বলেছে তদন্ত কমিটি করবে।'

'ওই গর্দভটার কথা ছাড়ুন,' হেসে বলল ভিজিল, 'কিন্তু আমার কি করার আছে? কাজের সুযোগ পাচ্ছি মাত্র চারঘণ্টা; রাত একটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত। তাতে কিছু হয় নাকি? প্রচুর সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—দেরি হচ্ছে।'

'উপায় নেই। ধৈর্য থাকতে চাইছে না আমাদেরও, কিন্তু কি করবেন বলুন। আপনি সাধ্যমত চেষ্টা করে যান। শুনুন,

রাতএকটার আগে আপনি পাওয়ার ব্যবহার করতে পারবেন না। এটা আমার অর্ডার। গত রাতে পৌনে বারোটায় কাজ শুরু করেছিলেন। দেখলেনই তো কি ফল হলো।'

'আমি কি বাচ্চা ছেলে নাকি, ম্যাডাম? আমি অত সময় বেঁধে কাজ করতে পারব না।'

কাউন্টেস খানিকটা নরম হলো।

'রাগ করছেন কেন? ফ্যাক্টরীর সঙ্গে কথাবার্তা সব পাকা। ইংল্যাণ্ড থেকে শীঘ্রিই মেশিনারী চলে আসছে। এবার আপনার খবর বলুন।'

'প্রগ্রেস হচ্ছে। শীঘ্রিই ইউরোপকে উড়িয়ে দেয়ার মত প্রয়োজনীয় মার্শানাইট তৈরি হয়ে যাবে।'

'মার্শানাইট মানে?'

হাসল ভিজিল।

'মার্শানাইট আমার গোপন অস্ত্রের নাম। আমার স্ত্রীর নাম থেকে নিয়েছি। সারা দুনিয়ার লোক আমাদের দুজনের নাম জানবে। শক্তি আর সৌন্দর্য হাতে হাত রেখে দুনিয়া জয় করবে।'

'ভাল,' প্রসঙ্গ পাল্টাল কাউন্টেস।

'মিস্টার ভিজিল, প্রফেসর সালাম আর গানস অ্যাণ্ড ব্রিসের লোকটা একসঙ্গে জুটেছে। ওদের ভাবগতিক সুবিধের ঠেকছে না।'

'কেন, ক্ষতির সম্ভাবনা আছে নাকি?' ভিজিলের কণ্ঠে

উদ্বেগ।

'মনে হয় না। ওদেরকে নজরে রাখা হচ্ছে। তাছাড়া মিনস্কির সাহায্য এখন পাবে কোথায়? ওকে ছাড়া একপাও আগে বাড়তে পারবে না। আপনি আর আমি ছাড়া ওদের ইনফর্মেশন জোগাড় করার আর কোন পথ নেই।'

'সালামটা গর্দভ। তবে আমার লাইনে কাজ করে যাচ্ছে সে-ও। ম্যানুফ্যাকচারিং ইনস্ট্রাকশন ওর হাতে পড়লে খুব মুশকিল হয়ে যাবে। আপনি ঠিক জানেন তো, মিনস্কির কপিটা নষ্ট করে দেয়া হয়েছে?'

'আমি নিশ্চিত।'

'তবে ওরা এখনও এখানে রয়েছে কেন?'

'রবিন্স লোকটা সহজে হাল ছাড়ে না। জোভোগোরোডে ওর বেশ কজন এজেন্ট আছে। প্রতিদিনই রিপোর্ট করে তারা। প্রেসিডেন্টের এক কর্মচারীকে ঘুষ দেয়ার চেষ্টা করছে ও।'

'কে সে?'

'চেস্কো। এক সময় আমার সেক্রেটারী ছিল। ও অবশ্য কিছুই জানে না। আমি বাধা দিচ্ছি না রবিন্সকে। ও ভুল লোকের পিছে ছুটে সময় নষ্ট করলে আমাদেরই সুবিধা। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। নিশ্চিন্তে কাজ করে যান।'

আবার ইস্ক্রানিয়ান ভাষায় ফিরে গেছে ওরা। রানা বুঝল আর অপেক্ষা করা বৃথা। জানার আর তেমন কিছু নেই। নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপের আড়াল নিতে এগোল ও।

রানার মনের ধোঁয়াটে ভাবটা কেটে গেছে। অনুভব করছে, কাজ শুরু করতে পারবে।

বেড়ার কাছে চলে এল ও। সহজেই টপকে নেমে এসে ফিরতি পথ ধরল। কয়েক গজ এগিয়েছে এমন সময় সামনে কিসের যেন শব্দ শুনতে পেল। পাখি হতে পারে, তবে সাবধানের মার নেই।

হামাগুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে এগোচ্ছে রানা। সতর্ক। ঝরা পাতা বা আলগা নুড়িতে যাতে পা না পড়ে সেজন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। পেছনে হঠাৎ পায়ের শব্দ। চরকির মত ঘুরল রানা। আক্রমণকারী ঘুসি ছুঁড়েছে। কিন্তু লাগাতে না পারায় টলে গেছে। সে সুযোগটাই নিল রানা। প্রচণ্ড ঘুসিতে ছিটকে পড়ল লোকটা, ঝোপের ওপর। তারপর স্থির। পড়ে রয়েছে উপুড় হয়ে।

দৌড়াবে কিনা ভাবল রানা। কিন্তু দৌড়ালে আলগা নুড়িতে শব্দ হবে। তাতে ল্যাবোরেটরীর লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে পারে। তাছাড়া, আক্রমণকারীর চেহারাটাও দেখা দরকার। ঠায় দাঁড়িয়ে রইল রানা। ল্যাবোরেটরীতে কোন সাড়াশব্দ নেই। ঝোপের ডাল পাতা সরিয়ে ভাল করে চাইল রানা।

লোকটার গাল আর কপাল কেটে রক্তের সরু একটা ধারা সৃষ্টি হয়েছে। আহত লোকটা হেনরী লিনফোর্ড, ট্রিবিউন পত্রিকার প্রতিনিধি।

নয়

মে নয়—দশ

ঝোপ থেকে হেনরী লিনফোর্ডকে সাবধানে সরিয়ে নিল রানা। ওকে শোয়াল সমতল মাটিতে। আঘাত খুব বেশি লাগেনি। ফলে, সামান্য পরেই চোখ মেলল লিনফোর্ড।

ঝুঁকে ফিসফিস করে বলল রানা, 'কথা বলবেন না, ওরা শুনে ফেলতে পারে। আরও কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিন। তারপর না হয় রওনা দেয়া যাবে।'

আধ ঘণ্টা পরে পাহাড়ের ওপরে উঠে এল রানা আর লিনফোর্ড। লিনফোর্ড খানিকটা খোঁড়াচ্ছে। রানা হাঁটতে সাহায্য করছে তাকে। একটা নদী পড়ল পথে। মাথা ধুয়ে নিল লিনফোর্ড। পকেট থেকে দোমড়ানো কটা সিগারেট বার করে একটা অফার করল রানাকে। কিন্তু রানা পাইপ ধরাল।

'প্রফেসর,' বলল লিনফোর্ড। 'ব্যাপারটা বোধহয় খোলাসা করা উচিত।'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'হ্যাঁ। এবার বলুন তো আমার ওপর হামলা করলেন কেন?'

'ভেবেছিলাম আপনি ওখানে কাজ করেন। কর্মচারী। আমাকে দেখে ফেলেছেন। তাই মার খাওয়ার আগেই মার দেয়ার চেষ্টা করেছিলাম।'

'আমারও একই কেস,' স্বীকার করল রানা।

'প্রফেসর, ওখানে হচ্ছেটা কি জানেন?'

এক মুহূর্ত ভাবল রানা।

'পরে আলাপ করব।'

'ঠিক আছে, চলুন।'

শহরের প্রান্তে যখন পৌছল ওরা তখন অন্ধকার ঘনিয়েছে। ট্যাক্সি নিয়ে সোজা একটা রেস্তরাঁয় চলে গেল ওরা। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে দুজনেরই। খাওয়া সারার আগ পর্যন্ত মুখ খুলল না কেউ। তারপর সিগারেট ধরাল লিনফোর্ড। হেলান দিল চেয়ারে।

'প্রফেসর, আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন।'

'বলুন, মিস্টার লিনফোর্ড,' বলল রানা। পাইপটা ধরিয়েছে।

'গানস অ্যাণ্ড ব্লিসের স্বার্থ আর আপনার স্বার্থ নিশ্চয়ই এক নয়?'

'ঠিকই ধরেছেন।'

'ফাইন।'

পকেট হাতড়ে পাসপোর্ট আর ট্রিবিউন প্রেস কার্ড বার করল লিনফোর্ড।

'এগুলো দেখার পর আর কোন দ্বিধা থাকবে না আশা করি। আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন। এবার বলছি শুনুন। সপ্তাহ তিনেক আগে আমাদের বুখারেস্ট প্রতিনিধি রিপোর্ট করেছে। জানিয়েছে, এ দেশে নাকি অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটছে। গোটা দুয়েক বিশাল বিস্ফোরণ হয়েছে। এতই প্রচণ্ড সেগুলো যে সলিড পাথরেও প্রায় দুশো মিটারের মত গর্ত তৈরি হয়েছে। আর বিস্ফোরণগুলো ঘটেছে লোকালয়ের বাইরে। তাছাড়া ইদানীং হঠাৎ করেই মিলিটারি এক্সারসাইজ শুরু হয়েছে; সেনাবাহিনীর বেতনও বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

'তো, আমাদের পত্রিকার ধারণা এখানে একটা কিছু ঘটবে। তাই আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে, ধারাবাহিক একটা আর্টিকেল লেখার জন্যে।

'প্রথম যেটা খটকা লেগেছে আমার সেটা হচ্ছে মিনস্কির মৃত্যু। কাউন্টেস ক্যারেনিনা এখানকার গভর্নমেন্ট, তারই তো বন্ধু ছিল মিনস্কি। ওকে কেন খুন করা হলো? লেকের পাশে নতুন যে ফ্যাক্টরীটা হয়েছে সেটার দায়িত্ব নেয়ার কথা ছিল তার। কেউ অবশ্য জানে না কি তৈরি করা হবে ওখানে। আমার ধারণা, আর্মস। গানস অ্যাণ্ড ব্লিসের আগ্রহও আমার ধারণাকে সমর্থন করে। গানস অ্যাণ্ড ব্লিস কি ইস্রানিয়ায়

আর্মস বিক্রি করছে? ঘুষ দিয়ে জানতে পেরেছি, করছে না।

'আরও জানতে পেরেছি "রেড শিল্ড সোসাইটি" নামে একটি সংগঠন আছে, আর্মি অফিসারদের। মিনস্কি এবং আরও অনেককেই নাকি খুন করেছে তারা। তাছাড়া, উপত্যকার গুপ্ত ল্যাবোরেটরীর খোঁজও পেয়ে গেছি। আজ ওখানে গিয়েছিলাম আড়ি পাততে, তা আপনি তো তার আগেই শুইয়ে দিলেন মাটিতে।'

'আপনার কথার মাঝখানে একটু বাধা দিচ্ছি, মিস্টার লিনফোর্ড,' বলল রানা, 'এতসব কথা আপনি জানলেন কিভাবে?'

'কপালের জোরে। ইয়াং ওয়ার্কার্স পার্টির নাম শুনেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'পার্টিটা চালায় আলেন্দে নামে এক নেতা। রয়্যালিস্ট সরকারের আমলে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয় তাকে। সে চলে গিয়েছিল নিউ ইয়র্কে। সেখানেই তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আমার। আলেন্দে সোশ্যালিস্ট। শ্রমিকদের দুরবস্থায় খেপে গিয়েছিল সে, আন্দোলন শুরু করেছিল। ফলে, নির্বাসন। দেশকে রিপাবলিক ঘোষণার পরে ফিরে আসে আবার। তবে তার মতে এখনকার অবস্থা আগের চেয়েও খারাপ। এখানে পৌঁছেই দেখা করেছিলাম তার সঙ্গে। প্রচুর সাহায্য করেছে সে। বি. .ষ করে মিনস্কির ব্যাপারে অনেক

কিছু জানিয়েছে।'

আরেকটা সিগারেট ধরাল লিনফোর্ড।

'আপনি বোধহয় ভাবছেন ইক্সানিয়ার নিজস্ব ব্যাপারে ট্রিবিউন এত আগ্রহ দেখাচ্ছে কেন।'

'ঠিক।'

'আমেরিকার কাছ থেকে প্রচুর টাকা ঋণ নেয়ার চেষ্টা করছে ইক্সানিয়া।'

'ওদের টাকার খুব দরকার,' সায় জানাল রানা।

'জানি। কিন্তু কেন?'

'ফুড ফ্যাক্টরী বানাবে।'

লিনফোর্ডকে দ্বিধান্বিত দেখাচ্ছে। সামনে ঝুঁকল রানা।

'খাবার,' ধীরে বলল ও। 'মিষ্টি তৈরি করবে, মিস্টার লিনফোর্ড। এমন মিষ্টি বানাবে ওরা যাতে শক্ত পাথরে দুশো মিটার গভীর গর্ত সৃষ্টি হয়। ওদের বানানো মিষ্টি লাখে লাখে মানুষকে মারবে।'

ভ্রূ কুঁচকাল লিনফোর্ড।

'আপনি বোধহয় আমার চেয়ে অনেক বেশিই জানেন, প্রফেসর। আমাকে বলতে আপত্তি আছে?'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রানা। তারপর মনস্থির করে নিল।

'বলতে পারি, তবে আপনি যদি সাহায্য করবেন বলে কথা দেন।'

ভ্রূ কুঁচকে কয়েক সেকেণ্ড কি যেন ভাবল লিনফোর্ড। তারপর বলল, 'যদ্দূর সম্ভব আমরা দুজন একই লাইনে চিন্তা করছি। ঠেকাতে হবে ওদের। ঠিক আছে, প্রফেসর, আছি আপনার সঙ্গে।'

'প্রথম কথা হচ্ছে, আমি প্রফেসর সালাম নই।'

'বলেন কি!' অবাক দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল লিনফোর্ড।

'ঠিকই বলছি।' সব কথা খুলে বলল রানা। জানাল, আসলে সে বাংলাদেশের একটি গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে জড়িত। তার নাম মাসুদ রানা। কিভাবে প্রফেসর সালাম তাকে খুঁজে বার করে একাজের দায়িত্ব চাপালেন, নিজের পাসপোর্ট, জামাকাপড় ধার দিয়ে কিছুদিন লুকিয়ে থাকার প্রস্তাব দিলেন—একে একে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল।

পাথরের মূর্তির মত বসে রয়েছে লিনফোর্ড। দু চোখে অবিশ্বাস। 'প্রমাণ দিতে পারবেন?'

'এই যে, প্রফেসরের পাসপোর্ট আমার কাছে,' দেখাল রানা।

পাসপোর্টটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করল লিনফোর্ড।

'কোন সন্দেহ নেই, এটা প্রফেসর সালামের পাসপোর্ট। কিন্তু এতে কি প্রমাণ হলো আপনি প্রফেসর সালাম নন?'

'কি প্রমাণ পেলে আপনি বিশ্বাস করবেন?'

'তাঁর লেখা কোন চিঠি বা কিছু।'

'হাতের লেখা চিনবেন?'

'একশোবার। তাঁর নিজ হাতে লেখা আর্টিকেলটা তো আমিই প্রেসে দিয়েছিলাম।'

ক সেকেণ্ড ভাবল রানা। লিনফোর্ডের সাহায্য তার দরকার, যেভাবেই হোক। হাসল ও। 'অপেক্ষা করুন। আমি তাঁর লেখা চিঠি নিয়ে আসছি। একটু হোটেলে যেতে হবে।'

বেরিয়ে গেল রানা। খানিকটা হেঁটে গিয়ে একটা স্টেশনারী দোকানে ঢুকে পড়ল। এক টুকরো কাগজ কিনে নিয়ে লিখলঃ

'প্রিয় মাসুদ রানা,

আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, অপনি যে করে হোক ইস্রানিয়ার সুপার নিউক্লিয়ার বোমা বানানোর পরিকল্পনা বানচাল করুন। এজন্য আমি আপনাকে আমার পাসপোর্ট এবং আমার ছদ্মবেশ গ্রহণ করার সমস্ত উপকরণ দেব এবং আপনার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত গা ঢাকা দিয়ে থাকব। আশা করি, বন্ধুর এই একান্ত অনুরোধ মানবতার খাতিরে রক্ষা করবেন।

—প্রফেসর সালাম

২০/৪/৮৮

দশ মিনিটের মধ্যে ফিরে এল রানা। চিঠিটা বাড়িয়ে দিল লিনফোর্ডের দিকে। চিঠিটা আগাগোড়া পাঁচবার পড়ল সাংবাদিক। তারপর ফিরল রানার দিকে। 'অবিশ্বাস্য! আশ্চর্য

মিল আপনাদের দুজনের চেহারায়!'

'তাহলে আমার কথা বিশ্বাস করছেন?'

'হ্যাঁ, তার কারণ আছে,' বলল লিনফোর্ড। পকেট থেকে একটা টেলিগ্রাম বার করে দেখাল। 'আমার অফিস থেকে এসেছে এটা।'

টেলিগ্রামটা পড়ল রানা। ওটায় লেখাঃ

সালাম উধাও। রহস্যজনকভাবে। বেশ ক'সপ্তাহ যাবত। সম্ভবত মৃত।

'তো এবার অপনার সাহায্য আশা করতে পারি নিশ্চয়ই?' জানতে চাইল রানা।

'অবশ্যই,' বলল লিনফোর্ড। বাড়িয়ে দিল হাত।

দ্বিতীয় পর্ব

দশ

লিনফোর্ডের জবানী

মে দশ

তথাকথিত মাসুদ রানার গল্প শুনে প্রথমে বিশ্বাসই হয়নি আমার।

সেজন্যে অবশ্য দোষ দিতে পারেন না আমাকে। এখনও ব্যাপারটা আমার কাছে স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে।

রানার সঙ্গে কাটানো সেই রোমাঞ্চকর দিন কটার কথা কিভাবে বর্ণনা করব ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

হ্যাঁ, ওকে আমি রানাই বলব। মাসুদ রানা। জোভোগোরোডে আসার আগে সে কে ছিল, এখনই বা কে, সে ব্যাপারে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই। আমার কাছে সে মাসুদ রানা।

ওর ব্যক্তিত্ব আশ্চর্য রকমের পরিবর্তনশীল। সাধারণ কাজে কর্মে সে সাধারণ মানুষ। কিন্তু কোন ধরনের সঙ্কটে

পড়লেই হলো, সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ তখন সে। একাই একশো। ও প্রায়ই একটা কথা বলে, বাঙালী নাকি একাই একশো; আবার একশো বাঙালী কখনোই এক হতে পারে না। হবেও বা। তবে বাঙালী যে দুঃসাহসী জাতি তার প্রমাণ একাত্তরেই পেয়ে গেছে সারা দুনিয়া। কাজেই মাসুদ রানা ব্যতিক্রম হতে যাবে কেন?

জোভোগোরোডে রানা যখন তার গল্প শেষ করল তখন রাত একটা। বেয়ারারা লাইট অফ করতে শুরু করেছে। আমি রবিন্স লোকটার প্রতি বিশেষ আগ্রহ অনুভব করছিলাম। ওকে ভালই চেনা আছে আমার। মানে, পরিচয় জানি আরকি। ও একজন আর্মস এজেন্ট, তবে আরও অনেক পরিচয়ে পরিচিত সে। গানস অ্যাণ্ড ব্লিসের ডিরেক্টরদের লিস্টে মোট জনা বিশেকের নাম আছে। রবিন্স তাদের একজন হতেও পারে। হয়তো চীনে তারই নাম ডিন জোন্স, দক্ষিণ আমেরিকায় পল মেরিনার আবার ইউরোপে রবিন্স। নিঃসন্দেহে ঘুঘু লোক।

রানা আবারও সবিশেষ অনুরোধ করেছে, যাতে এডিটরকে আমাদের আলোচনার কথা না জানাই।

'ভয় পাবেন না,' বলেছি আমি। 'এসব কথা জানালে এডিটর আমাকে নির্ঘাত পাগল ভেবে বসবে। নট হয়ে যাবে আমার চাকরি।'

দেখে মনে হলো স্বস্তি পেয়েছে ও।

'মিস্টার লিনফোর্ড,' বলেছে ও, 'আমরা দুজনে কি একসঙ্গে কাজ করতে পারি?'

দ্বিধায় পড়ে গেলাম আমি।

'আমি ইমোশনাল সাপোর্টের কথা বলছি না,' বলেছে ও। 'আমার ধারণা, আমাদের জুটি হলে দুজনেরই লাভ। আপনি পাবেন স্টোরি; আর আমারও কাজ উদ্ধার হবে।'

হাত মেলালাম আমরা। ঠিক হলো, পরদিন সকালে আমার হোটেলে আসবে ও।

রানা যখন পৌঁছল তখনও আমি বিছানায়। গড়াগড়ি খাচ্ছি। ওর চোখ দুটো জ্বলজ্বল করতে দেখলাম।

'রবিন্স বলেছে কালকের মধ্যেই ভিজিলের ফর্মুলা পেয়ে যাচ্ছে ও।'

সিগারেট ধরালাম।

'কিন্তু কাউন্টেস তো বলছিল রবিন্স মিছেই সময় নষ্ট করছে।'

'রবিন্স বুদ্ধিতে হয়তো টেক্কা মেরে দিয়েছে তাকে। ওকে খুব আত্মবিশ্বাসী দেখলাম। বলছে, পরশুর মধ্যেই জোভোগোরোড ছাড়বে।'

'আপনি কি করবেন ভাবছেন? ও ফর্মুলা পেয়ে যাওয়ার পর কোনভাবে ওটা হাতিয়ে নেবেন?'

'না,' বলল ও। 'কাজটা কঠিন। ফর্মুলার এখন আর মাত্র দুটো কপি আছে। একটা ভিজিল, আরেকটা কাউন্টেসের

কাছে। আমার বিশ্বাস রবিন্স কাউন্টেসের কপিটাই চুরির চেষ্টা করবে। কারণ, ভিজিলের আস্তানা সুরক্ষিত। কাউন্টেস থাকে কোথায়?'

'রয়্যাল প্যালেসের কাছেই, বিশাল বাড়ি।'

'কপিটাও সম্ভবত ওখানেই রাখে। পাহারার ব্যবস্থা কেমন?'

'কোন গার্ড তো দেখিনি।'

'তারমানে কড়া পাহারা রাখা হয়। এখন আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে রবিন্সের প্ল্যানটা জানা। তারপর ওকে ঠেকানো। আজ বিকেল চারটায় এজেন্টদের সঙ্গে ওর মীটিং।'

'ভাল কথা। কিন্তু তাতে আমাদের কি লাভ? ওদের কথা শুনতে হলে কাবার্ডে লুকিয়ে থাকা ছাড়া আর তো কোন উপায় দেখছি না।'

হাসল রানা।

'সেজন্যেই তো আপনার সাহায্য চাইছি। আজ তিনটের দিকে আমার ঘরে একবার আসতে পারবেন? তার আগে অবশ্য আমার একটা উপকার করতে হবে। গোটা দুয়েক টেলিফোন বক্সে যাবেন, তার কাটার জন্যে। রিসিভার দুটো নিয়ে আসবেন, তার সহ। কাজটা খুব সাবধানে সারতে হবে। খুব জরুরী।'

'দুটো রিসিভারের কি দরকার?'

রহস্যময় হাসল রানা।

'বিকেলেই দেখতে পাবেন। আমার কিছু কাজ আছে। এখন চলি। বিকেলে দেখা হচ্ছে, মিস্টার লিনফোর্ড।'

যাওয়ার আগে বলল ও, 'ওহহো, একটা কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। আপনার বন্ধু আলেন্দের সঙ্গে দেখা করতে চাই। সম্ভব?'

বেলা এগারোটার দিকে হোটেল ছেড়ে বেরোলাম। কুডবেকের দিকে হাঁটছি। মনে আছে, ওখানকার পোস্ট অফিসে বেশ কটা টেলিফোন বক্স দেখেছি।

তার খুব শক্ত। এতটা যে শক্ত হবে ভাবিনি। ছুরিটাও ভোঁতা। ফলে, কাজটা সহজ হলো না। ভয়ে ঘেমে উঠলাম আমি। তবে শেষ পর্যন্ত সফলও হলাম। রিসিভার দুটো ওভারকোটের পকেটে চালান করে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম।

ফিরতি পথে একটা ক্যাফেতে ঢুকলাম। মনটা ড্রিংক দাবি করছে। ক্যাফের ভেতরটা জনাকীর্ণ, তবে একটা সাদা মাথা দৃষ্টি কাড়ল আমার। আলেন্দে। তার পাশে বসে রয়েছে মাঝবয়সী এক লোক। ঠোঁটের ওপর কালো গোঁফ, চোখজোড়া ধূসর নীল। টেবিলটার দিকে ভিড় ঠেলে এগোলাম। উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল আলেন্দে।

'মিস্টার লিনফোর্ড,' মৃদু হেসে বলল আলেন্দে, 'কোমাচিনের সঙ্গে পরিচয় আছে?'

ঘাড় নাড়লাম আমি।

কোমাচিনের সঙ্গে ইক্সানিয়ান ভাষায় কিসব যেন বলল আলেন্দে। কোমাচিন বো করল আমাকে। পরবর্তী ক'মিনিট ওদের দুজনের মধ্যে দ্রুত কথোপকথন হলো। আলেন্দের মুখে কোমাচিনের কথা আগেই শুনেছিলাম। কথা মানে প্রশংসা। কোমাচিনের প্রশংসায় আলেন্দে পঞ্চমুখ। বোঝা গেল, আলেন্দের প্রতিও সমান সম্মান পোষণ করে কোমাচিন।

যাহোক, কথা শেষ হলো ওদের। কোমাচিন উঠে পড়েছে। আমাকে আবারও বো করে বেরিয়ে গেল।

আলেন্দেকে জানালাম এক বাঙালী ভদ্রলোক দেখা করতে চান ওর সঙ্গে।

'জানি,' স্মিত হাসল আলেন্দে। 'আমার এক লোক আপনাদের হোটেলের বেয়ারা। মাইকেল নাম। এও জানি বাঙালী ভদ্রলোকটি নাম সালাম। রবিন্সের বন্ধু।'

সালামের সঙ্গে বৈঠকে রাজি হলো না ও।

'এই সালাম লোকটা,' ব্যাখ্যা করে বলল আলেন্দে, 'খুব নাজুক অবস্থায় রয়েছে। ও সেটা জানে কিনা জানি না। তবে ওকে ঘিরে একটা ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা দানা বাঁধছে। সেজন্যেই দেখা করব না ওর সঙ্গে। খামোকা রিস্ক নিতে চাই না আমি। আপনি আমার বন্ধু, আপনাকে বলছি লোকটাকে এড়িয়ে চলবেন।'

এরপর প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল আলেন্দে। খানিক বাদে বিদায় নিয়ে চলে গেল ও। ওর বলিষ্ঠ শরীর আর সাদা

চুলগুলো চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত চেয়ে রইলাম আমি। এখন ভিড়ে মিশে গেছে ও।

ওকে আর কোনদিন দেখিনি।

এগারো

মে দশ–এগারো

সেদিন বিকেল। তিনটা বাজতে মিনিট পাঁচেক বাকি। রানার ঘরে পৌঁছে গেলাম আমি। উদ্গ্রীব হয়ে বসে ছিল ও। প্রায় কেড়ে নিল রিসিভার দুটো।

'ছুরিটা সঙ্গে আছে?' জানতে চাইল ও।

দিলাম ওটা। বিছানার পাশে যে বেলটা রয়েছে সেটার তার কেটে নিল ও। দেয়াল থেকে চার মিটারের মত তার ছিঁড়ে ফেলল।

'ভাববেন না। পাগল হইনি আমি,' বলল রানা। 'ওদের কথা শুনব আমরা। সেজন্যেই দুটো রিসিভার আনতে বলেছিলাম।'

'মাইক্রোফোন কোথায় পাবেন?'

'দেখাচ্ছি।'

দরজা খুলল ও। আঙুল দেখাল করিডরের উল্টো দিকের

দরজাটার দিকে।

'ঘরটা রবিন্সের। ভেতরে টেলিফোন আছে। ওটাই আমাদের মাইক্রোফোন।'

বেলের তারের শেষাংশটা আমাকে দেখাল ও।

'ওর দরজার বাইরেই টেলিফোনের তার আছে। আপনি দাঁড়ান এখানে। পাহারা দিন। কাউকে আসতে দেখলেই শিস দিয়ে সাবধান করবেন।'

করিডরের শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। অপেক্ষা করছি। দেখতে পেলাম টেলিফোন কেবলে কি যেন করছে রানা। করিডরের কার্পেটের তলা দিয়ে তার ঢুকিয়ে দিল ও। তারপর হাতছানি দিয়ে তার বেডরুমে ডেকে নিল আমাকে। তারের শেষ প্রান্তটা টেনে এনেছে সে। এবার দরজা বন্ধ করে দিল।

'তারগুলো জোড়া দিলাম,' বলল ও। 'রিসিভার দুটোয় এখন ওদের সব কথা শুনতে পাব।'

'রবিন্সের টেলিফোন কি হুকে ঝোলানো?'

মাথা নেড়ে হাসল রানা। বিজ্ঞের হাসি।

'ও লাঞ্চ করতে যাওয়ার পর কটা ম্যাচের কাঠি আটকে দিয়েছি হুকের নিচে—দেখার উপায় নেই। তবে যতটুকু প্রয়োজন তোলা গেছে হুকটাকে।'

'আর নিচের টেলিফোন অপারেটর? ওর ব্যাপারে কিছু ভেবেছেন?'

'হ্যাঁ। হলের ক্লার্ক টেলিফোনটা ব্যবহার করে। ওকে পাঠিয়েছিলাম আমার জন্যে একটা টাইম টেবল আনার জন্যে। ও চলে গেলে ইণ্ডিকেটরে একটা পিন গুঁজে দিয়েছি। ফলে, হুকটা যে ওঠানো তা ধরার আর কোন রাস্তা নেই।'

'রবিন্স যদি ফোন করার চেষ্টা করে?'

'জানতেই পারব। দরজার তলা দিয়ে তার টেনে নিলেই ডিসকানেক্ট হয়ে যাবে।'

ওর প্রশংসা না করে পারলাম না।

রিসিভার দুটো শীঘ্রিই কানেক্ট করা হলো। দরজার পাশে বসে রইলাম আমরা, শোনার জন্যে।

সাড়ে তিনটার দিকে ঘরে ঢুকল রবিন্স। শুনতে পেলাম, পায়চারি করছে। তারপর নৈঃশব্দ। তিনটে পঞ্চাশের দিকে বেয়ারা ঢুকল ঘরে। রবিন্স তাকে বলে দিল কোথায় ড্রিংকের ট্রে রাখতে হবে।

চারটের সামান্য পরে প্রথম লোকটিকে স্বাগত জানাল রবিন্স। ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা হতে শুনলাম। ভাগ্যিস রবিন্স ইক্সানিয়ান ভাষা জানে না। পরবর্তী ক'মিনিটে আরও কয়েকজন ঘরে ঢুকল। নিচু স্বরে কথাবার্তা চলছে। সাড়ে চারটের মধ্যে হাজির হয়ে গেল সকলে। শুনতে পাচ্ছি রবিন্স সবার মনোযোগ আকর্ষণ করছে। মুহূর্তে সবাই নিশ্চুপ। এবার কথা বলতে শুরু করেছে রবিন্স।

'মাই ফ্রেণ্ডস,' বলছে ও, 'আপনারা জানেন আমি কি

চাই। এটাও জানেন সেফটা কোথায় রয়েছে। এ ব্যাপারে কোন ভুল হলেই মরণ। ব্লখিন সবই বলে দিয়েছে বেলানভকে। কাজেই চিন্তার কারণ নেই। আমি শুধু কাগজগুলো চাই, আর কিছু না। টাকা পয়সা বা গয়নাগাটি যা-ই পাওয়া যাক না কেন সেটা আপনাদের। আপনারা ভাগাভাগি করে নেবেন। টাকার খাঁই নেই আমার।'

বলে চলেছে রবিন্স, 'পেমেন্টের অর্ধেকটা পাবেন এখন। বাকিটা পাবেন বেলানভ কাগজগুলো আমাকে ডেলিভারি দেয়ার পর।'

বিড়বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করছে লোকগুলো। কিন্তু মসৃণভাবে বলে চলেছে রবিন্স :

'পেমেন্ট ক্লিয়ার করার আগে আমার এক্সপার্টকে দিয়ে কাগজগুলো পরীক্ষা করিয়ে নেয়া হবে। সে অবশ্য জোভোগোরোডেই আছে।'

পিন পতন নিস্তব্ধতা। বলছে রবিন্স ঃ 'কাগজ হাতে পেলেই সোজা আমার কাছে চলে আসবে বেলানভ; ধরুন রাত দুটো নাগাদ। তারপর আমার সঙ্গে এখানেই থাকতে পারে সে, আমাকে পাহারা দেয়ার জন্যে। আমি যাতে পালিয়ে যেতে না পারি সেটা দেখবে ও। আরেকটা কথা, খুব দরকার ছাড়া খুনোখুনি করতে যাবেন না। ব্যস, আমার কথা শেষ। টাকাটা আমি...'

আর শোনা গেল না। রানা তার টেনে নিয়েছে। ঘরে

চলে এসেছে ওটা।

'কুইক,' বলল ও, 'ওরা বেরিয়ে আসার আগেই ক্যাফেতে চলে যাব আমরা। আমি চাই না রবিন্স আপনাকে এখানে দেখুক।'

পকেটে তার ঢোকাল রানা। আর আমি রিসিভার দুটো ওভারকোটের পকেটে রেখে দিলাম। ট্যাক্সি নিয়ে সোজা কুডবেক। রানার চাপাচাপিতে একটা টেলিফোন বক্সে রেখে দিয়ে এলাম রিসিভার দুটো। তারপর গিয়ে বসলাম ক্যাফেতে।

কফি খেতে খেতে পরবর্তী পরিকল্পনার কথা আলাপ করে নিলাম।

'ব্লখিন নিশ্চয়ই সেফের দরজা খোলার নম্বর বলে দিয়েছে ওদের,' বলল রানা। 'কেউ যাতে বোমা বানাতে না পারে সেটা দেখাই আমাদের প্রথম কাজ। প্রতিটি কপি নষ্ট করে ফেলতে হবে। ভিজিলের দায়িত্ব আপনি আমার ওপর ছেড়ে দিতে পারেন।'

'আমার মনে হয়, রানা,' বললাম, 'খুব বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলছেন আপনি। ব্যাপারটা আন্তর্জাতিক। তাছাড়া পলিটিক্সে জড়ানো আমার ঠিক হবে না।'

ওকে বোঝাতে চাইলাম সংখ্যায় আমরা খুবই কম। সাহায্য ছাড়া এক পাও আগে বাড়া অসম্ভব।

এক মুহূর্ত ভাবল রানা।

'ঠিকই বলেছেন। আপনার কথা মানতেই হবে। সাহায্য দরকার আমাদের। আলেন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।'

জানালাম, আলেন্দে দেখা করতে আগ্রহী নয়। শান্তভাবে খবরটা হজম করল রানা।

'সময় আসুক,' বলল ও, 'ঠিকই লাইনে এনে ফেলব ওকে।'

আমার সন্দেহ আছে। চাইলে তর্ক করতে পারতাম। করলাম না।

'আমরা মাত্র দুজন। দশ জনকে ঠেকাব কিভাবে? আমাদের উপস্থিতি জানতে পারলেই তো খতম করে দেবে।'

'একটা বুদ্ধি আছে,' সহজ গলায় বলল রানা। কাউন্টেসের বাড়ির বর্ণনা দিল ও। আজ সকালে দেখে এসেছে। তার মতে, খুব সহজেই ঢোকা যাবে ও বাড়িতে।

'সুখবর,' বললাম আমি, 'কিন্তু রবিন্সের অতগুলো লোকের সঙ্গে এঁটে উঠবেন কিভাবে?'

সামনে ঝুঁকে পড়ল রানা। একনাগাড়ে মিনিট দশেক কথা বলে গেল। ওর কথা শেষ হলে ডাঙায় আটকা পড়া মাছের মত অবস্থা হলো আমার। দুর্দশাগ্রস্ত। লোকটার প্রতি আর ভরসা রাখতে পারছি না।

'ওভাবে পার পাবেন ভেবেছেন?' তিক্তকণ্ঠে জানতে চাইলাম।

'কেন নয়?' বিস্মিত দেখাচ্ছে তাকে।

'সরি, রানা। আমাকে বাদ দিতে হবে। ঝুঁকি নিতে আপত্তি নেই আমার। কিন্তু আপনার প্ল্যান অনুযায়ী চললে সোজা জেলে যেতে হবে।'

হাসল ও।

'বেশ, একাই যাব আমি।'

হঠাৎই মেজাজ চড়ে গেল আমার। ওর প্ল্যানটা স্রেফ পাগলামি। সাধ্যমত বাধা দিয়েছি, যুক্তি দেখিয়েছি কিন্তু কোনই কাজ হয়নি।

'যা আছে কপালে,' বেপরোয়া হয়ে উঠলাম আমি, 'আমরা রওনা হচ্ছি কখন?'

বারো

মে দশ—এগারো

পরবর্তী ক'ঘণ্টা যেভাবে কাটল তা জীবনে ভুলব না আমি।

মাঝরাতে রওনা দিলাম আমরা। রবিন্সের আশা, বেলানভ দুটোর মধ্যে পৌঁছবে তার কাছে। তার মানে রাত একটার দিকে হামলাটা করবে ওরা।

রাতের আঁধারে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা রয়্যাল প্যালেসে চলে গেলাম। সেখান থেকে কাউন্টেস যে স্কয়্যারে থাকে সেখানে।

চমৎকার তারা ভরা রাত। রূপালী চাঁদও রয়েছে। শীতটাও নেমেছে জাঁকিয়ে। দ্রুত হাঁটছি দুজনে। রাস্তায় লোক নেই। কাউন্টেসের বাড়িটা অন্ধকারই বলা চলে। কেবল দোতলার একটা ঘরের ভারি পর্দার ওপাশ থেকে আসছে আবছা আলোর রেখা।

কাউন্টেসের বাড়ির আঙিনা আর একটা উঁচু দেয়াল ঘেরা

বাগানের মধ্য দিয়ে সরু পথ গেছে। রানার পিছে পিছে সে রাস্তা ধরেই এগোলাম। ঢোকার মুখে লোহার গেট। তালা দেয়া।

ওভারকোটের পকেট হাতড়াল রানা। বার করে আনল কি যেন। জিনিসটা ওর হাতে ঝিলিক মারল, আক্রমণ করল তালাটাকে। ক'মিনিট বাদেই ঘরঘর শব্দে খুলে গেল গেট। চাপা গলায় গালি দিয়ে উঠল রানা। পাথরের মূর্তির মত জমে গেছি। কিন্তু সামনের গেটের গার্ড বোধহয় শব্দটা শোনেনি। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর রাস্তাটা ধরে আগে বাড়লাম আমরা।

পথটা প্রায় খাড়াভাবে নেমে গেছে নিচের দিকে। দুপাশের দেয়ালগুলো দৈত্যের মত মাথা উঁচিয়ে দাঁড়ানো। বাইরের আলো ঢোকার পথ বন্ধই করে দিয়েছে প্রায়। দেয়ালের পাশ ঘেঁষে হাতড়ে এগোলাম আমরা। প্রায় এক কিলোমিটার হাঁটার পর থেমে ফিসফিসিয়ে বলল রানা, 'সাবধানে হাঁটবেন। সুইমিং পুলের কাছাকাছি এসে পড়েছি আমরা।'

রানার পিছু নিয়ে সিঁড়ির দু তিন ধাপ উঠলাম। কাছেই কেশে উঠল এক লোক, ম্যাচ জ্বালিয়েছে। গার্ড। পেছোলাম খানিকটা।

'সিঁড়ির মাথা থেকে দশ মিটারের মত দূরে রয়েছে ও,' ফিসফিস করে বলল রানা। 'পানির দিকে সরিয়ে দিচ্ছি ওকে।

আমি সিগন্যাল দিলেই ছুটবেন। তবে, শব্দ যাতে না হয়।'

সিঁড়ির ওপর পড়ে থাকা একটা বেশ বড়সড় পাথর তুলে নিল রানা। ওকে হাত ছুঁড়তে দেখলাম। খানিকটা সামনে ছলাত করে শব্দ হলো। আমাদের ওপর দিক থেকে পায়ের শব্দ পেলাম। রানা ফিসফিসিয়ে বলল, 'আসুন!'

পায়ের পাতায় ভর দিয়ে ওর পেছন পেছন সিঁড়ির মাথায় চলে এলাম। সেখান থেকে বাগানে, তারপর ঘাসে লম্বা হলাম। দেখতে পেলাম একজন গার্ড আমাদের বেশ খানিকটা দূর দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। হাতে টর্চ। বাড়িটাকেও দেখা গেল হঠাৎই, যেন অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। উঠেই এক ছুটে আমরা একটা দেয়ালের ছায়ায় আড়াল নিলাম। হাঁপ ধরে গেছে। আমাকে ওখানে দাঁড়াতে বলে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল রানা।

দশ মিনিট পরে ফিরে এল ও।

'ভেতরে গিয়েছিলাম,' নিচু স্বরে বলল, 'সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের একটা খোলা জানালা দিয়ে। দোতলার কোণার ঘরটাতেই আমাদের কাজ।'

'কিভাবে বুঝলেন?'

'ওটাতেই কেবল তালা দেখলাম। আসুন।'

'সামনের গেটের গার্ডটা?'

'নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে।'

ড্রেন পাইপ বেয়ে একটা জানালার কার্নিসে উঠে পড়েছে

রানা। বলাইবাহুল্য জানালাটা বন্ধ। পকেট থেকে সেই যন্ত্রটা বার করে কাজে লেগে পড়ল ও। (পরে জেনেছি জিনিসটা ও বানিয়েছিল হোটেলের একটা কাঁটাচামচ থেকে।) মিনিট খানেক পরেই খুলে গেল জানালা, ভেতর দিকে। ওর পিছু নিয়ে নরম কার্পেট বিছানো মেঝেতে নেমে পড়লাম। জানালা বন্ধ করে দিয়েছে রানা।

ম্যাচের কাঠি জ্বালল ও। ঘরে আসবাবপত্র বিশেষ নেই। ভারি পর্দাগুলো তোলা রয়েছে।

'পর্দাগুলোর পেছনে লুকিয়ে পড়ুন,' বলল রানা।

দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে আড়াল নিলাম দুজনে। জানালার ঠিক পাশেই।

'এখন?' ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'অপেক্ষা করুন। দেখতে পাবেন।'

অপেক্ষা করছি। ভাবছি রানা লুকাতে বলল কেন। ও কি কিছু টের পেয়েছে? ঠিক সে মুহূর্তেই জানালার বাইরে 'থপ' করে পায়ের শব্দ হলো। মুহূর্ত পরেই বন্ধ জানালা খোলার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল কেউ। খুলেও ফেলল তক্ষুণি। রবিন্সের লোক পৌঁছে গেছে। নিঃশ্বাস ফেলতে ভয় পাচ্ছি, শুনে ফেলে যদি!

ঘরে পা রেখেছে এক লোক। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট তার অবয়ব। ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবার ঘাড় ফিরিয়ে চারদিকটা দেখে নিল। টর্চ জ্বালিয়েছে। এগোচ্ছে সে। চলে গেল আমার

চোখের আড়ালে।

হাত বাড়ালাম আমি, রানার হাত ছোঁয়ার জন্যে। ঠাণ্ডা স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠলাম। পিস্তল। পরমুহূর্তেই সরে গেল রানা। সেকেণ্ড দুয়েক পরেই মেঝেতে ভারি কিছু পতনের শব্দে আবার চমকাতে হলো।

'জলদি,' চাপা গলায় ডাকছে রানা।

বেরিয়ে এলাম পর্দার আড়াল ছেড়ে। আহত লোকটার ওপর ঝুঁকে রয়েছে রানা। দেয়ালের গোলাকার সেফটা খোলা।

'কেউ নিচে আছে কিনা দেখুন তো,' বলল রানা।

পা টিপে টিপে জানালার কাছে গেলাম। চাইলাম নিচের দিকে। চাঁদের আলোয় একটা মাথা পরিষ্কার চোখে পড়ল। সাবধানে ফিরে এসে জানালাম রানাকে। কালো একটা ফাইলে তখন মনোযোগ তার, টর্চের আলোয় কাগজপত্র দেখছে। ইরানিয়ান ভাষায় লেখা। তবে নিউক্লিয়ার ফর্মুলার পৃষ্ঠাগুলো সব ভাষাতেই এক। কাজেই বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না।

আচমকা জানালার বাইরে থেকে 'হিস' শোনা গেল। 'বেলানভ,' একটা কণ্ঠস্বর নরম গলায় ডাকছে। তক্ষুনি টর্চ নিভিয়ে দিল রানা। কাগজগুলো সেফে রেখে দিয়ে দরজাটা লক করে দিল।

ছুরির ঝলকানিটা সময় মতই দেখতে পেয়েছিলাম।

মেঝেতে শোয়া লোকটা অর্থাৎ বেলানভ আক্রমণ করতে উদ্যত হতেই লাফালাম আমি। ওর গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছি দুজনে। প্রচণ্ড শক্তি লোকটার গায়ে। আমাকে পেড়ে ফেলে উঠে বসল বুকের ওপর। ছুরিটা তুলেছে এমন সময় চিতার মত সামনে বাড়ল রানা। ওর প্রচণ্ড লাথিতে লোকটা একটা ডেস্কের সঙ্গে বাড়ি খেলো। ফ্লাওয়ার ভাসটা ডেস্ক থেকে মেঝেতে পড়ে চুরমার হয়ে গেল।

'জানালায় দেখুন!' গর্জে উঠল রানা। আমি যখন উঠলাম তখন আবারও লড়াই বেধে গেছে রানা আর বেলানভের। জানালার পাশে ছায়া দেখে ছুটে গেলাম। আমার ঘুসিটা লোকটার গালের হাড়ে লাগল। বসে পড়তে বাধ্য হলো ও। কিন্তু পরক্ষণেই উঠে পড়ল আবার। জানালা গলে লাফিয়ে পড়ল নিচে। ছুটে ফিরে এলাম ঘরে। রানার মার খেয়ে চেয়ার উল্টে মেঝেতে চিতপাত হয়ে পড়ে রয়েছে বেলানভ। হঠাৎ আমার বাহু আঁকড়ে ধরল রানা। টেনে নিয়ে গেল পর্দার পেছনে। কারণটা বুঝতেও দেরি হলো না। পায়ের শব্দ দ্রুত স্পষ্টতর হচ্ছে।

শব্দটা বেলানভও শুনেছে। উঠেই জানালার দিকে ছুটেছে ও। দরজায় চাবি ঢোকানোর শব্দ হলো। দেয়ালের সঙ্গে প্রায় সেঁটে রয়েছি আমরা। জানালা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়েছে বেলানভ। দরজার কাছ থেকে দুটো গুলির শব্দ শুনে

কানে তালা লেগে গেল আমার। পড়িমড়ি করে জানালা দিয়ে ঝাঁপাল বেলানভ। নিচে পড়ার পর ওর পা পিছলেছে, স্পষ্ট শুনতে পেলাম। বাড়ির সামনের দিক থেকে চিৎকার শোনা যাচ্ছে। কোন সন্দেহ নেই গুলির শব্দে গার্ডের ঘুম ভেঙেছে। ছুটন্ত পদশব্দ এবং তার পরপরই আরও গুলির আওয়াজ কানে এল। এদিকে ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে।

ধড়াস করে উঠল হৃৎপিণ্ড। ধরা পড়ে গেছি! ঘরে কোন সাড়াশব্দ নেই। তারপর পরিচিত একটা শব্দ শুনলাম, সেফটা খোলা হয়েছে। বন্ধও করা হলো। পিস্তলধারী চলে গেছে। আমাদের দেখতে পায়নি। জোর বাঁচা বেঁচে গেছি।

'আসুন,' বলল রানা।

দশ সেকেণ্ড পরে ঘরের বাইরে চলে এলাম আমরা। সেই পাইপটা বেয়ে জানালার নিচে এসে দাঁড়িয়েছি। আগুনের শিখা দেখা গেল, গুলি। চিৎকার।

'ওই সরু পথটা দিয়ে গেলে ধরা পড়ে যাব,' ফিসফিসিয়ে বলল রানা। 'বেলানভ তার দলবলসহ ওখানেই আছে। আমাদের যেতে হবে সামনের গেট দিয়ে।'

দূর প্রান্তে গোলাগুলি চলছে। লন ধরে তীরবেগে ছুটলাম আমরা। বাইরে বেরিয়ে আসতেও বেগ পেতে হলো না।

ট্যাক্সিতে বসে রয়েছি তখন আমরা। শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এলে মুখ খুললাম আমি। কটা প্রশ্ন বড্ড খোঁচাচ্ছে

আমাকে।

'ওই লোকগুলো গার্ডদের ফাঁকি দিয়ে ভেতরে ঢুকল কিভাবে?'

'খুব সোজা। সব কটাকে ছুরি মেরেছে। এ ধরনের কাজে ছুরির বাড়া কিছু নেই। নিঃশব্দে কাজ সারা যায়। এসব দেশে এ অস্ত্রটার খুব চল।'

'তাই হবে। কিন্তু ঘরে ঢুকে গুলি করল কে?'

'কাউন্টেস। সে নিশ্চিত হতে চাইছিল যে ভিজিলের ফর্মুলা জায়গা মতই আছে। সেজন্যে সেফ খুলে পরীক্ষা করে দেখেছে। খুব সম্ভব ফর্মুলা এখন আর সেফে নেই। নিরাপদ কোন জায়গায় ওটা রাখার চেষ্টা করবে কাউন্টেস। গুলি কি লাগাতে পেরেছে বেলানভের গায়ে?'

'আমার ধারণা হাতে লাগিয়েছে।'

চিন্তিত দেখাচ্ছে রানাকে। আমার দিকে চাইল। অদ্ভুত ওর চোখের দৃষ্টি।

'আশ্চর্য মেয়ে,' মৃদু গলায় বলল ও। 'গুলি ঠিকই লাগিয়ে দিয়েছে। ওর চুলগুলো দারুণ না?'

আমি চুপ করে বসে রইলাম। প্রাণপণ চেষ্টা করছি হাসি চাপতে। এই দুঃসাহসী লোকটি প্রেমে পড়েছে।

তেরো

মে এগারো

পরদিন সকালে মর্মান্তিক দুঃসংবাদটা পেলাম। রানা জানাল, গত রাতে খুন করা হয়েছে আলেন্দেকে। রানাকে বলেছে হোটেলের বেয়ারা, সকালের খাবার দেয়ার সময়। লোকে সম্মান করত আলেন্দেকে, ফলে নিন্দায় ফেটে পড়ল সবাই। মনে প্রচণ্ড কষ্ট পেলাম, রাগও হলো।

রানাকে যখন আলেন্দের সঙ্গে আমার আলোচনার কথা জানালাম তখন ও বলল, 'আলেন্দে আমাদের চেয়ে কম জানত না। সেজন্যেই কাউন্টেস কোন ঝুঁকি নেয়নি। আলেন্দেকে পথের কাঁটা মনে করে সরিয়ে দিয়েছে। ও চুপ করে বসে থাকার লোক নয় বুঝেই জান কোতল করেছে।' হঠাৎ কথা থামিয়ে আমার চোখে সরাসরি চাইল ও।

'লিনফোর্ড,' গম্ভীর শোনাল ওর কণ্ঠস্বর। 'কোমাচিনের সঙ্গে জলদি যোগাযোগ করা দরকার।'

'ও কোথায় থাকে জানি না তো।'

'যেভাবেই হোক জানতে হবে। পুরো ব্যাপারটাই গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে। আজ সকাল থেকে রবিন্সকে দেখছি না। ভোরে নাকি বেরিয়ে গেছে। বেলানভ যদি আমাকে চিনে থাকে তবে মুশকিল—বিরাট বিপদ। রবিন্সকে জানাবেই ও।'

মাইকেল অর্থাৎ আলেন্দের লোক হিসেবে পরিচিত বেয়ারাটিকে ডাকিয়ে আনা হলো। আমরা হত্যার বদলা নিতে চাই শুনেই কোমাচিনের ঠিকানা দিয়ে দিল সে। তক্ষুনি রওনা হলাম।

খানিক বাদে থেমে পড়ল রানা।

'ওরা আমাদের ফলো করছে না,' বিড়বিড় করে ওকে বলতে শুনলাম। 'ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না আমার কাছে।'

আরও খানিকদূর হাঁটলাম। তারপর আবার থামতে হলো। ট্যাক্সি নেব ঠিক করলাম।

ট্যাক্সিতে চেপে মিনিট তিনেক চলার পর হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠল রানা, 'ভুল রাস্তায় যাচ্ছি আমরা!'

ট্যাক্সির জানালাগুলো বন্ধ। বড্ড ঘুম ঘুম পাচ্ছে আমার। কুয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে মস্তিষ্ক। জানালা খুলতে রীতিমত কসরত করছে রানা। বৃথা। ঢলে পড়ল সীটে, আমার পাশে। জ্ঞান হারালাম আমিও।

চোখ মেলে দেখি সুসজ্জিত এক ঘরের মেঝেতে শুয়ে রয়েছি আমি। পাশেই রানার অচেতন দেহ। তবে খানিক পরেই আড়মোড়া ভেঙে চোখ মেলল ও। পিটপিট করে

চাইছে। ইউনিফর্মধারী এক অফিসার চেয়ে রয়েছে আমাদের দিকে। উঠে দাঁড়াতে নির্দেশ দিল সে। আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো একটা ঘরে। মুহূর্তে চিনে ফেললাম আমি। এ ঘরেই গত রাতে হানা দিয়েছিলাম আমরা। একটা ডেস্কে আমাদের দিকেই মুখ করে বসে রয়েছে কাউন্টেস। পেছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

নির্বাক দৃষ্টিতে দু সেকেণ্ড চেয়ে দেখল কাউন্টেস। এত কাছ থেকে আগে আর দেখিনি তাকে। দূর থেকে সুন্দরী মনে হত, এখন দেখলাম সত্যিই অপরূপা। আলেন্দের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এই রূপসীকে জড়াতে মন টানছে না আমার।

'হচ্ছেটা কি এখানে?' প্রায় গর্জে উঠল রানা। 'আমাদের ধরে এনেছেন কেন?'

ওর কথার জবাব দিল না কেউ।

'কে আপনি? আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহারের কারণ কি?' রাগে কাঁপছে রানা। 'আপনাকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে। খুব সম্ভব ট্রেনে পরিচয় হয়েছিল। কই, তখন তো এতটা অভদ্র মনে হয়নি।'

'কেমন ব্যবহার আশা করেন আপনি?' বরফ শীতল কণ্ঠ কাউন্টেসের। রাগের লেশমাত্র নেই।

'এটা কি মগের মুল্লুক নাকি যে রাস্তা থেকে ধরে এনে আটকে রাখবেন?' ক্রোধে ফেটে পড়েছে রানা।

রানার দিকে চাইল কাউন্টেস, ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের হাসি।

'বোকা সাজছেন? লাভ হবে না। মিস্টার লিনফোর্ড, বলে দিন তো আমি কে।'

'কাউন্টেস ক্যারেনিনা,' বললাম আমি।

আমোদ পাচ্ছে যেন কাউন্টেস।

'খুব অবাক হয়েছেন, তাই না, প্রফেসর?'

'অবশ্যই,' দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করল রানা। 'তবে আপনার ব্যবহারে আরও বেশি অবাক লাগছে।'

'অনেক হয়েছে। আর নাটক দেখতে চাই না,' ঠাণ্ডা গলায় বলল কাউন্টেস। একটা কাঁটা চামচের মত কি যেন বার করল ডেস্ক থেকে। তলপেট খালি খালি লাগছে আমার। বেলানভের সঙ্গে মারামারি করার সময় ওটা নির্ঘাত পড়ে গেছে রানার পকেট থেকে।

'জানেন নিশ্চয়ই,' বলল কাউন্টেস, 'কাল রাতে এখানে হামলা হয়েছিল। এই কাঁটাচামচটা পাওয়া গেছে মেঝেতে। হোটেল কন্টিনেন্টালের জিনিস। আপনি ওই হোটেলেই উঠেছেন। গতকাল বিকেলে আপনার সঙ্গে হোটেলে দেখা করেছেন মিস্টার লিনফোর্ড। রাত দেড়টার দিকে চোর ঢুকেছিল এখানে। আমিই বাধা দিই ওদের। রাত আড়াইটার আগে আপনারা কেউই হোটেলে ফেরেননি। এসময়টায় কোথায় ছিলেন আপনারা দুজন?'

জবাব দিতে পারলাম না। জবাব বোধহয় আশাও করেনি কাউন্টেস। বলে চলেছে ঃ 'আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, প্রফেসর, আগুন নিয়ে খেলবেন না। আপনি প্রফেসর, শ্রদ্ধেয় লোক। ল্যাবোরেটরী হচ্ছে আপনার জায়গা; অথচ আপনি কিনা পরের ব্যাপারে নাক গলাতে চাইছেন। আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, শীঘ্রি ইংল্যাণ্ডে ফিরে যান। চব্বিশ ঘণ্টা সময় পাবেন। তারপরও যদি এদেশ না ছাড়েন তবে তার পরিণতির জন্যে কিন্তু আমি দায়ী থাকব না। আর মিস্টার লিনফোর্ড, আপনি জোভোগোরোডে থাকতে পারবেন, তবে এক শর্তে। নিজের পেশার বাইরের অন্য কোন ব্যাপারে আগ্রহ দেখানো চলবে না।'

একটা সুইচ টিপল কাউন্টেস। খুলে গেল দরজা। জনৈক অফিসারকে ইক্সানিয়ান ভাষায় কি যেন আদেশ করল সে। আবার বন্ধ হলো দরজা। আমার দিকে আবার ফিরল কাউন্টেস।

'যদ্দূর জানি আলেন্দে আপনার বন্ধু ছিল, তাই না?'

মাথা ঝাঁকালাম। কথা সরল না মুখে।

'বেচারা অকালে মরল। খুব বুদ্ধিমান লোক ছিল—আমার সঙ্গে বেশ কয়েকবার কথাবার্তা হয়েছে।'

চুপ করে রইলাম।

পেছনে খুলে গেছে দরজা। ফিরে চাইলাম। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রয়েছে লম্বা মত পাতলা এক লোক। চোখ দুটো

বিষণ্ন। তবে পুরুষ্টু গোঁফটা তার চেহারার নিষ্ঠুরতাকে ঢাকতে পারেনি এতটুকু। ডান চোখের ওপরে দুটো পুরানো কাটা দাগ। বীভৎস।

'এই ভদ্রলোক হচ্ছেন,' বলল কাউন্টেস, 'কর্নেল ইগর—আমার চীফ অফিসার।'

সামান্য বো করল লোকটা।

'প্রফেসর সালাম আর মিস্টার লিনফোর্ডকে দেখার জন্যে ডেকেছিলাম আপনাকে,' ফ্রেঞ্চ ভাষায় বলল কাউন্টেস। 'যাতে দরকার পড়লে এঁদের আবার চিনতে পারেন।'

ইগরের বিষণ্ন চোখ দুটো একে একে জরিপ করল দুজনকে।

উঠে দাঁড়িয়ে রানার উদ্দেশে বলল কাউন্টেস, 'কাল সকাল দশটায় কর্নেল ইগরের সঙ্গে দেখা হচ্ছে আপনার। স্টেশনে। সীমান্ত পর্যন্ত উনি এগিয়ে দেবেন আপনাকে। গুডবাই, প্রফেসর।'

এক ঘণ্টা পরে লাঞ্চ সারতে সারতে পুরো ঘটনাটা নিয়ে আলাপ করলাম আমরা। রানা নিশ্চিত যে মিনস্কি আর আলেন্দের খুনের পেছনে কর্নেল ইগরের হাত আছে।

'পরের টার্গেটটা আমি,' বলল ও। 'আমি এ দেশ ছাড়লেও নিশ্চিন্ত হতে পারবে না ওরা। ওদের ভয়, আমি তো মুখ বন্ধ রাখব না। তাছাড়া রবিন্স আমাকে কদ্দূর বলেছে এখনও জানে না ওরা। কাউন্টেসের বাড়িতে আজ সকালেই

খতম হয়ে যেতাম হয়তো। কিন্তু বেঁচে গেছি আপনার কল্যাণে। সাংবাদিকের সামনে কাজটা করতে চায়নি। আমার ধারণা, যখনই ওরা বুঝতে পারবে আপনার সঙ্গে আমার আর কোন যোগাযোগ নেই তখনই জানে মেরে দেবে আমাকে।'

অকাট্য যুক্তি।

'তবে আপনাকে বোধহয় ইক্স্রানিয়া ছাড়তেই হবে।'

'ছাড়ব না, মাটি কামড়ে পড়ে থাকব। এখানকার কাজ শেষ হয়নি আমার।'

একটা প্রশ্ন না করে পারলাম না। বড্ড জ্বালাতন করছে প্রশ্নটা।

'আপনার আসল পরিচয়টা? সবাই কিন্তু এখনও আপনাকে প্রফেসর সালাম বলে মনে করছে। সত্যি করে বলবেন কোন্‌টা আপনার আসল পরিচয়?'

'আসল পরিচয়? হয়তো শীঘ্রিই জানাতে পারব।'

চুপ করে গেছে রানা। বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সামনের দিকে। এবার আমার দিকে ফিরল।

'আমাকে গা ঢাকা দিতে হবে; এছাড়া আর কোন পথ দেখছি না। এদেশ ত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অনেক কাজ বাকি এখনও।'

'কিন্তু লুকোবেন কোথায়?'

'কোমাচিনের সঙ্গে এক্ষুণি দেখা করা দরকার,' বলল ও।

'সে হয়তো সাহায্য করতে পারবে।'

ওকে অনেক করে বোঝাতে চাইলাম ব্যাপারটা বিপজ্জনক। কিন্তু আমার কথা কানে তোলার পাত্র নয় ও।

'আমি বলছি না আপনি জীবনের ঝুঁকি নিন। তবে যদি আমাকে সাহায্য করতে চান তাতে আপত্তিও করব না।'

তর্ক করতে চাইলাম। কিন্তু ও আলেন্দের খুনের কথা ওঠাতেই বুঝলাম ওকে বুঝিয়ে লাভ হবে না। সেটিই শেষবার। এরপর আর তর্ক করিনি ওর সঙ্গে।

কোমাচিনের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম। আমাদের পেছনে আর ফেউ নেই, সরিয়ে দেয়া হয়েছে।

কোমাচিনের বাড়িটা পুরানো শহরের সরু এক গলির মধ্যে। বেল বাজালাম। খাটো, গাঁট্টাগোঁট্টা এক লোক দরজা খুলল, হাতে রাইফেল। খানিকক্ষণ ধরে আমাদের আইডেন্টিটি কার্ড পরীক্ষা করল সে। তারপর চার তলার একটা ঘরে নিয়ে গেল। আসবাবপত্র বলতে তেমন কিছুই নেই ঘরে। শুধু একটা খাট, টেবিল আর কটা চেয়ার। টেবিলে পিস্তল হাতে বসে রয়েছে কোমাচিন।

আমরা ঢুকতেই উঠে দাঁড়াল সে। আমাকে চিনতে পেরে পিস্তল নামাল। এগিয়ে এসে ফরাসি ভাষায় অভ্যর্থনা জানাল। ওর সঙ্গে রানার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বসলাম সবাই।

'আলেন্দের বন্ধু হিসেবে এসেছি আমরা,' কথা শুরু

করলাম আমি।

'এখানে আসতে হবে বুঝলেন কিভাবে?'

'আলেন্দের এক বন্ধু বলেছে।'

মাথা ঝাঁকাল কোমাচিন।

'আলেন্দে আপনার কথা অনেক বলেছে,' বলল ও। ভ্রূ উঁচিয়ে রানাকে দেখাল। 'কিন্তু এ লোক তো বন্ধু নয়। একে রবিন্সের সঙ্গে দেখা গেছে।'

'তা ঠিক, তবে আপনাকে বুঝিয়ে বললেই আপনি ব্যাপারটা বুঝবেন,' বলল রানা।

'আপনার কাছে আসার প্রধান কারণ,' বললাম আমি, 'আমাদের বিশ্বাস আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারব। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে আমাদের নিজেদেরও সাহায্য প্রয়োজন। আপনি আলেন্দের বন্ধু বলেই আশা করে আপনার কাছে এসেছি।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কোমাচিন। হেঁটে চলে গেল ঘরের কোণে। গাঢ় নীল চোখ দুটোয় জল টলমল করছে। ওকে চোখ মুছতে দেখলাম। আমরা নিশ্চুপ বসে রয়েছি। শেষ পর্যন্ত আমাদের দিকে ফিরল ও। চেহারা আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

'কি সাহায্য চান শুনি,' বলল ও।

পুরো ঘটনাই খুলে বললাম। প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় পার হয়ে গেল এতে।

চিন্তিত ভঙ্গিতে চিবুকে হাত বুলাচ্ছে কোমাচিন।

'মঁসিয়ে লিনফোর্ড, আপনি যা বললেন তার বেশিরভাগটাই আমাদের জানা। তবে আমরা আরও কিছু ব্যাপার জেনেছি। এখন যেটা জানতে চাই সেটা হচ্ছে ঃ প্রফেসর কি চান? ভিজিলের ফর্মুলা হাতিয়ে কি উনি নিজের কাজে লাগাবেন?'

ঠাণ্ডা চোখে রানাকে দেখছে ও।

জবাব দিল রানা।

'আমি শুধু চাই ভিজিলের ফর্মুলা চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাক। চাই গানস অ্যাণ্ড ব্লিস বা অন্য কেউ যাতে বিজ্ঞানের আর কোন অপব্যবহার করতে না পারে। কিন্তু এও জানি এভাবে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। কোন না কোন কোম্পানী কোন না কোনভাবে বোমা তৈরি করবেই। তবে গানস অ্যাণ্ড ব্লিসের মত কোম্পানীদের যত দেরি করিয়ে দেয়া যায় ততই মঙ্গল।'

'এতই যদি বোঝেন তবে রবিন্সের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন কেন?' প্রশ্ন করল কোমাচিন।

'ওটা একটা চাল। রবিন্সের দলে ঢোকার ভান করায় অনেক কিছু সহজে জানা হয়ে গেছে।'

'হয়তো যুক্তি আছে আপনার কথায়,' বলল কোমাচিন।

'আমিও চাই ধ্বংস হয়ে যাক ভিজিলের ফর্মুলা। আমার দেশে নিউক্লিয়ার বোমা তৈরি হোক তা আমি বা আমার দল

কখনোই চাইনি।'

চিবুকে ঘন ঘন হাত বুলাচ্ছে কোমাচিন। এবার ফিরল আমাদের দিকে।

'আপনারা দুজন যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছেন। সেজন্যে ইয়াং ওয়ার্কার্স পার্টির তরফ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

আমাদের আলোচনা এরপর ভিন্ন প্রসঙ্গে মোড় নিল। কোমাচিনের পার্টি যে বিপ্লব ঘটানোর চিন্তাভাবনা করছে তাও সে জানাল আমাদের। বুঝতে পারলাম, বিশ্বাস করছে সে আমাদের দুজনকে। সরকারের কঠোর সমালোচনা করল ও। ওর মতে, কাউন্টেস ক্যারেনিনা দেশ পরিচালনায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ। সে চায় কেবল ক্ষমতা আর সম্মান। ওদিকে সাধারণ মানুষের পেটে খাবার নেই। দুবেলা দু মুঠো খাবারের নিশ্চয়তা চায় তারা। খুব দ্রুত সংগঠিত হচ্ছে পার্টি, তৈরি হচ্ছে অভ্যুত্থানের জন্যে।

বিকেল নাগাদ আমি বেরিয়ে পড়লাম কোমাচিনের বাড়ি থেকে। রানা রয়ে গেছে ও বাড়িতে, একটা খালি ঘরে। ওটাই এখন থেকে ওর গোপন ঠিকানা। বলা যায় কোমাচিনই একরকম ধরে বেঁধে রেখে দিয়েছে ওকে। আমি অবশ্য ঠিক করলাম, স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগে কোমাচিন আর তার দলকে খবর জোগান দেব। কোমাচিনও অবশ্য রবিন্সের ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করেছে।

চোদ্দ

মে এগারো–একুশ

ইতোমধ্যে দশ দিন পেরিয়ে গেছে। রানার সঙ্গে আর দেখা হয়নি।

তবে বরিস নামে পার্টির এক বিশ্বস্ত লোক প্রতিদিনই টেলিফোন করে আমাকে; বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন টেলিফোন বক্স থেকে। ওর কথাতেই জেনেছি সবই পরিকল্পনা মাফিক এগোচ্ছে। আরও জেনেছি রানার পরিকল্পনা মনঃপূত হয়েছে কোমাচিনের। সেই মোতাবেকই কাজ করে চলেছে ওরা।

বরিসের সঙ্গে ক্যাফেতে দেখা করলাম একদিন। জিজ্ঞেস করলাম প্রফেসর সালামের কথা। চোখ চকচক করে উঠল ওর। 'প্রফেসর'-এর প্রশস্তি গাইল ও, কিন্তু কাউন্টেসের প্রতি প্রফেসরের আকর্ষণের কথা বলার সময় কেমন যেন হয়ে গেল ওর মুখের ভাব। কাউন্টেসের একটা পোস্টকার্ড সাইজের ছবির দিকে চেয়ে থেকে নাকি প্রচুর সময় নষ্ট করে প্রফেসর।

বরিস অবশ্য আরও গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে এসেছে আমার

জন্যে। শীঘ্রিই নাকি অ্যাকশনে নেমে পড়ছে ওরা।

তেরো তারিখে যথারীতি কুডবেকে মর্নিং ওয়াক করতে গেছি। হোটেল ছাড়তেই অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। রাস্তায় জটলা পাকাচ্ছে লোকজন, উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাদেরকে। ক্যাফেতেও আজ ভিন্ন দৃশ্য। নিচু স্বরে, গোপন কোন ব্যাপার নিয়ে যেন আলোচনা করছে ক্রেতারা। রাস্তায় প্রচুর পুলিস। নার্ভাস দেখাচ্ছে তাদেরকে। খবরের কাগজ কিনলাম। জানতে পারলাম না বিশেষ কিছুই। ক্যাফের বেয়ারাকে প্রশ্ন করেও কোন লাভ হলো না। ব্যাটা এমন ভান করল যেন আমার কথা বোঝেইনি। হোটেলে ফিরে এলাম। অপেক্ষা করছি বরিসের ফোনের জন্যে। হঠাৎ মনে পড়ল মাইকেলের কথা। বেল বাজালাম। অন্য এক বেয়ারা এল। মাইকেলের কথা জিজ্ঞেস করাতে চুপ করে রইল। শেষে চাপাচাপির ফলে মুখ খুলতে বাধ্য হলো। মাইকেল নাকি অসুস্থ, কাজে আসেনি। ওর কথা বিশ্বাস করতে পারলাম না।

অপেক্ষা করতে করতে যখন অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছি ঠিক তখনই এল বরিসের ফোন।

'কিছু মনে করবেন না,' দ্রুত বলল ও। 'সিগারেট।'

'সিগারেট' একটা সাঙ্কেতিক শব্দ। এর অর্থ 'জলদি আসুন।' হ্যাট আর কোট খামচে তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম তক্ষুণি। বড় রাস্তা এড়িয়ে অলিগলি ধরে প্রায় সারাটা পথই

একরকম ছুটলাম। দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল বরিস। আমাকে ওপরে নিয়ে গেল।

কোমাচিনের ঘরটা দেখে আর্মি হেডকোয়ার্টার মনে হচ্ছে। ঘরে গুরুত্বপূর্ণ কোন যুদ্ধের ঠিক আগের পরিবেশ। রানা আর কোমাচিন টেবিলের ওপর ঝুঁকে বড় একটা ম্যাপ দেখছে। ঘরে জনা ছয়েক ইক্সানিয়ানও রয়েছে। নিচু স্বরে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে তারা। আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল কোমাচিন, রানার যেন কোনদিকে খেয়াল নেই। একমনে ম্যাপ দেখছে। অন্যদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল বরিস। কোমাচিন খানিকবাদে আমাকে টেবিলে ডেকে নিয়ে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল।

তারপর ঝানু রাজনীতিকের মত সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানাল আমাকে। ওদের প্ল্যান হচ্ছে সেনাবাহিনীর মনোযোগ জোভোগোরোড থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া। সেই ফাঁকে ওরা শহরে ওদের কর্মসূচী বাস্তবায়িত করবে। ইতোমধ্যেই দক্ষিণ আর উত্তরের দুটো শহরে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়েছে। সরকার ওদুটো জায়গায় ন হাজার সৈন্য পাঠিয়ে দিয়েছে। জোভোগোরোডে এখন মাত্র হাজার খানেক সৈন্য আছে। ওদিকে ইয়াং ওয়ার্কার্স পার্টির কর্মীরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে জোভোগোরোড শহরের দিকে এগোচ্ছে। আগামীকাল রাত একটার দিকে শহরে ছড়িয়ে পড়বে তারা। সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে সরকারকে উৎখাত করবে।

'তারপর, মঁসিয়ে লিনফোর্ড,' বলে চলল কোমাচিন, 'আবার যোগাযোগ স্থাপনের পর আপনার সাহায্য খুবই প্রয়োজন। প্রথমেই বুখারেস্টের স্বীকৃতি চাই। তারপর প্যারিস, লণ্ডন আর ওয়াশিংটন। আমরা জানি এসব দেশে আপনার কিরকম প্রভাব।'

'কিন্তু...,' বলতে চাইলাম আমি।

'আপনি যা যা চান মিস্টার লিনফোর্ড সবই করবেন,' বাধা দিয়ে বলল রানা।

প্রতিবাদ করার সময় পেলাম না। কোমাচিন আর তার লোকেরা এরমধ্যেই একদফা আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে দিয়েছে।

পরে রানাকে রবিন্সের কথা জিজ্ঞেস করলাম।

'ও কি মতলব আঁটছে জানি না,' বলল রানা। 'তবে আজ রাতের মধ্যে যদি চলে না যায় তবে আর বাঁচবে কিনা সন্দেহ।'

হঠাৎ ঘরের ভেতরের বেলটা বেজে উঠল। কারও মুখে রা নেই। জানালার কাছে গিয়ে উঁকি দিল বরিস। তারপর এক ছুটে বেরিয়ে গেল ঘরের বাইরে। যখন ফিরল তখন তার দৃষ্টি কোমাচিনের দিকে, কিন্তু রানাকে উদ্দেশ্য করে বলল:

'প্ল্যাট,' হাঁফাচ্ছে ও, 'গুলি খেয়েছে। তবে বহু কষ্টে পৌঁছেছে এখানে। রবিন্স তার দলবল নিয়ে গাড়িতে করে ভিজিলের ল্যাবোরেটরীর দিকে গেছে। আধ ঘণ্টা আগে।'

পনেরো

মে একুশ—বাইশ

এক মুহূর্ত নিশ্চুপ সবাই। কোমাচিনের দিকে চাইল রানা। মাথা ঝাঁকাল কোমাচিন।

বরিসের পিছে পিছে বেরিয়ে পড়লাম আমি আর রানা। অসংখ্য সরু প্যাসেজ পেরিয়ে ছোট্ট একটা উঠনে চলে এলাম। কোমাচিন আমাদের জন্যে গাড়ি আর ড্রাইভারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

শহরের বাইরে চলে আসতে সময় লাগল না। খানিক বাদেই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। রাস্তার জায়গায় জায়গায় গর্ত, বৃষ্টির ফলে পিছলও হয়ে গেছে। ফলে খুব সাবধানে গাড়ি চালাতে হচ্ছে ড্রাইভারকে। আমার হাতে একটা পিস্তল ধরিয়ে দিল রানা। বলল, 'রেখে দিন। কাজে আসতে পারে।'

উপত্যকার পাশের রাস্তা ধরে মিনিট বিশেক যাওয়ার পর হেডলাইট নিভিয়ে গাড়ি থামানোর নির্দেশ দিল রানা। আমরা

তিনজন হেঁটে এগোলাম। বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণ নেই। রাস্তায় প্যাচপেচে কাদা, পা দেবে যায়। শেষ পর্যন্ত ডানে মোড় নিলাম আমরা। প্রায় এক কিলোমিটার চড়াইয়ের পর থামল রানা। ফিসফিসিয়ে আমাদের দুজনকে অপেক্ষা করতে বলে মিশে গেল সামনের অন্ধকারে। ফিরল ক'সেকেণ্ড পরেই। খানিক দূরেই নাকি একটা গাড়ি দেখা যাচ্ছে, ভেতরে এক লোক বসা।

রানার নির্দেশ মত বরিস আর আমি নেমে আসতে লাগলাম গাড়িটার দিকে। পঞ্চাশ মিটারের মত নামার পর দেখতে পেলাম গাড়িটাকে। আমরা এগোতেই ড্রাইভারের দরজাটা খুলে গেল ধীরে ধীরে। লোকটা বেরিয়ে এসেছে। আমাদের সঙ্গে ওর দূরত্ব এখন মাত্র দু মিটার। আমাদের দেখে ফেলেছে ও। ঝট করে তার হাত চলে গেছে পিস্তলে। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে ততক্ষণে। একটা ছায়ামূর্তি পেছন থেকে ভারি কিছু দিয়ে বাড়ি মেরেছে ওর মাথায়। হাঁটু মুড়ে ভূমিশয্যা নিল লোকটি।

ঝুঁকে লোকটিকে একবার দেখে নিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা।

লোকটাকে বেঁধে ফেললাম আমরা। মুখটা কষে বাঁধলাম স্কার্ফ দিয়ে। তারপর চ্যাংদোলা করে তার অচেতন দেহটা গাছের আড়ালে ফেলে দেয়া হলো। রানা গাড়ির এঞ্জিনের কি যেন একটা ছোট্ট যন্ত্রাংশ খুলে নিয়ে পকেটে পুরল। নামতে

শুরু করলাম আবার, ল্যাবোরেটরীর দিকে। ইলেকট্রিক তারের কাছে পৌঁছে দেখি গেট হাট করে খোলা। ঢুকে পড়লাম নিঃশব্দে। বাড়িটা প্রায় অন্ধকারই বলা চলে, কেবল দূর প্রান্তের একটা ঘরে আবছা আলোর আভাস।

'কোণার দিকে ল্যাবোরেটরীতে ঢোকার একটা রাস্তা আছে,' বলল রানা। 'আমি ওখান দিয়েই ঢুকব। শেষ প্রান্তে আরেকটা দরজা পাবেন। ওটা আপনাদের জন্যে। আমি ওদের ঘিরে ফেলতে চাই, তবে মনে রাখবেন আমি সিগন্যাল না দেয়া পর্যন্ত কিচ্ছু করবেন না। সিগন্যাল দিলে গুলি চালাবেন।'

আমরা দুজন রওনা দেব ঠিক এমন সময় একটা তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার ভেসে এল ল্যাবোরেটরীর দিক থেকে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি দুজনেই। তাড়া লাগাল রানা। দেয়ালের কাছে পৌঁছে শ্বাস নেয়ার জন্যে এক মুহূর্ত দাঁড়ালাম। তারপর পা বাড়ালাম ল্যাবোরেটরীর উদ্দেশে।

পেট গুলাচ্ছে আমার, ভয়ে। চিৎকারটা রক্ত হিম করে দিয়েছে। রানার বলে দেয়া দরজাটা খুঁজে বার করতে বেগ পেতে হলো না। ওটা আস্তে করে খুলল বরিস।

ল্যাবোরেটরীর মধ্যখানে পাঁচজন লোক, অর্ধ বৃত্তাকারে দাঁড়ানো। রবিন্স আর হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বেলানভকে চিনতে পারলাম। তবে চেয়ারের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা লোকটির প্রতিই নজর চলে গেল আমার। দেখে মনে হচ্ছে

লোকটা মেকানিক। ওর মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে বুকে, বোধহয় জ্ঞান নেই। রড হাতে এক লোক হিংস্র ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল তার দিকে। হাঁটুতে মারার জন্যে তুলেছে রডটা। মুহূর্তে মাথা জাগাল চেয়ারের লোকটা। প্রাণভয়ে আবার চেঁচিয়ে উঠেছে। চোখজোড়া বিস্ফারিত, মুখ হাঁ।

রডওয়ালা মারেনি। আবার ভান দেখাল মারবে। এবার সত্যিই জ্ঞান হারিয়েছে মেকানিকটি। অন্য আরেকজন এগিয়ে এসেছে ইতোমধ্যে। প্রচণ্ড কয়েকটা ঘুসি বসিয়েছে অজ্ঞান লোকটার মুখে। ঘুসি খেয়ে যেন জ্ঞান ফিরল তার। বেলানভ এগিয়ে গিয়ে ইক্সানিয়ান ভাষায় কি যেন বলল তাকে। পাশেই দাঁড়িয়ে রবিন্স, চুরুট ফুঁকছে। প্রশ্ন যা করার বেলানভই করছে। মেকানিক বেচারা হয় জানে না আর না হয় ইচ্ছে করেই উত্তর দেয়নি প্রশ্নের। ফলে রডওয়ালা হাত দুটো মাথার ওপর তুলে কাছে এগোল। প্রাণপণে দড়িমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে লোকটি। চেঁচাচ্ছে। বরিসের দ্রুত শ্বাস নেয়ার শব্দ স্পষ্ট শুনছি আমি।

পকেটে রাখা পিস্তলে শক্ত হলো আমার হাত। রানার নির্দেশের তোয়াক্কা করলাম না। নিষ্ক্রিয় দর্শকের মত লোকটির দুর্দশা দেখা আর সম্ভব নয় আমার পক্ষে। এক ধাক্কায় দরজাটা খুলে ধেয়ে গেলাম ল্যাবোরেটরীর ভেতরে।

আমার প্রথম দুটো গুলি লাগল উল্টোদিকের দেয়ালে। পরের দুটো বিঁধল মেঝেতে। পরমুহূর্তে অবশ হয়ে এল

আমার কব্জি। মেঝেতে পড়ে গেছে পিস্তল। যে লোকটার গুলি খেয়েছি সে তাক করছে আবার। আচমকা আমার পেছন দিকে যেন প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হলো। কানে তালা লাগার উপক্রম। পিস্তলবাজ মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে। বরিস আবার গুলি করার আগেই সাইলেন্সড পিস্তলের ভোঁতা শব্দ শুনলাম; দরজার দিক থেকে এসেছে। কাচ ভাঙার ঝনঝন শব্দ, বাতিটাও গেছে।

আমার বাহু আঁকড়ে ধরেছে বরিস। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম, আড়াল নেয়ার জন্যে। রাস্তায় নেমে আসতেই পেছনে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হলো। ল্যাবোরেটরীর দিক থেকে গুলির শব্দ শুনলাম। আর্তনাদ করে উঠল কেউ, গুলি হলো আবার। ধাওয়া করছে না এখন কেউ। থেমে পড়ে কান পাতলাম আমরা। আমাকে অপেক্ষা করতে বলে ল্যাবোরেটরীর উদ্দেশে পা বাড়াল বরিস।

বেশ ভালই রক্তপাত হচ্ছে আমার। রুমাল দিয়ে ক্ষতস্থানটা পেঁচিয়ে ধীর পায়ে ল্যাবোরেটরীর দিকে এগোলাম। কয়েক মিটার যেতেই পৌঁছলাম বেড়ার কাছে। থামলাম। স্পষ্টই শুনলাম সামনের ঝোপে কেউ একজন নড়াচড়া করছে। হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়লাম। নিরস্ত্র, আহত অবস্থায় আর কিইবা করার আছে। ওদিকে ঝোপের মধ্যকার শব্দটা হচ্ছেই। গেটের দিকে এগোচ্ছে কেউ। হঠাৎ সার্চলাইটের উজ্জ্বল আলোয় পরিষ্কার হয়ে গেল অন্ধকার।

ছাদ থেকে আসছে আলো। নিশ্চয়ই রানা বা বরিস অপারেট করছে ওটা। নিচু হলো আলো। আস্তে আস্তে ঝোপের দিক এগোচ্ছে। এসময় অন্ধকার ফুঁড়ে হঠাৎই আলোর ঝলকানি এবং তার পর পরই গুলি হলো। আলোটা লাফিয়ে উঠে থেমে গেল। দাঁড়িয়ে রয়েছে বেলানভ। অভিনেতা স্টেজে যেভাবে আলোকিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকে ঠিক সেভাবে।

আলোয় ধরা পড়ে নিচু হয়ে এক পাশে সরে যেতে চাইল ও। ওকে অনুসরণ করল আলো। সামনে বেড়া। আচমকা দাঁড়িয়ে উঠেই বেড়ার দিকে ঝেড়ে দৌড় দিল ও। বেড়া যখন টপকাতে চেষ্টা করছে তখন পরিষ্কার দেখতে পেলাম তাকে। তবে বেড়া টপকানো হলো না তার। তারে হাত ছোঁয়াতেই শক্ত হয়ে গেছে সে, বেঁকে গেছে শরীর। পায়ের পাতা মাটির সামান্য ওপরে, হাঁটু ভাঁজ; দেখে মনে হলো প্রবল ভার চাপানো হয়েছে তার ওপর। বইতে পারছে না সে। আলতোভাবে খসে পড়ল ও। একটিবারের জন্যেও আর নড়তে দেখলাম না ওকে।

আলোটা একবার যেন পুরো জায়গাটাকে ঝাড়ু দিয়েই নিভে গেল। পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ডাকছে বরিস। উঠে দাঁড়ালাম।

'আসুন, মঁসিয়ে। আর চিন্তা নেই, কারেন্ট অফ করা হয়েছে। বেড়ায় কারেন্ট দেয়ার আগেই রবিন্স তার এক স্যাঙাতকে নিয়ে পালিয়েছে। তবে ওদের গাড়িটা তো

আগেই বিকল করে দেয়া হয়েছে। ফলে, লম্বা হাঁটা মারতে হবে ওদের।'

'কিন্তু ওর দলের অন্যদের কি খবর?'

'বেলানভের দশা তো দেখলেনই। আমি যাকে গুলি করেছিলাম সে ব্যাটা মরেছে। প্রফেসরের গুলিতে আরেকটা গেছে।' সামান্য থেমে বলল ও, 'প্রফেসর দারুণ ফাইটার।'

'চেয়ারে বাঁধা লোকটার কোন খবর জানেন?'

'মনে হয় মারা গেছে।'

বাইরেই থাকল বরিস। আমি ঢুকলাম ল্যাবোরেটরীর ভেতরে। রানাকে দেখলাম এক রাশ কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করছে। ছোট একটা ডেস্কও হাতড়াল ও।

'উঁহুঁ,' বলল ও, 'কিচ্ছু পেলাম না। কোন জায়গা তো খুঁজতে বাদ রাখিনি।'

'রানা,' বললাম আমি, 'কিছু মনে করবেন না। সব কিছুর জন্যে আসলে আমিই দায়ী। এ ধরনের কাজ করার কোন যোগ্যতা আমার নেই।'

হাসল ও।

'বাদ দিন। আপনি তখন গুলি না করলে আমাকেই শুরু করতে হত। ওদের একেবারে বোকা বানিয়ে দিয়েছিলেন। যাহোক, আপনার কব্জির কি অবস্থা?'

দেখালাম ওকে। পেশাদারি চোখে ও পরীক্ষা করল ব্যাণ্ডেজ।

'চিন্তার কিছু নেই,' মন্তব্য করল ও। 'তবে ব্যাণ্ডেজটা ঠিকমত বাঁধতে হবে। দেখুন কোথাও ব্যাণ্ডেজ খুঁজে পান কিনা।'

সামনে একটা দরজা। ওটা দিয়ে ঘরে ঢুকতেই হাতের ডানে একটা খাট দেখতে পেলাম। সঙ্গে লাগোয়া বাথরুমও রয়েছে। দেয়ালের মেডিসিন বক্সে ব্যাণ্ডেজ পেয়ে গেলাম। পুরো বক্সটাই ল্যাবোরেটরীতে নিয়ে এলাম। রানা তখন মেঝেতে বসে ছড়ানো ছিটানো কাগজগুলোয় আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে।

'যে কাগজগুলো আমরা চাই সেগুলো এখানে নেই,' বলল ও। জ্বলন্ত কাগজগুলোর দিকে ভ্রূ নাচিয়ে দেখাল। 'আমি কোন রিস্ক নিচ্ছি না। এখানে এমন কোন কাগজ থেকে থাকতে পারে যেটা ঝানু কারও হাতে পড়লে বিপদ হয়ে যাবে।'

'কি করবেন তবে?'

'পুরো জায়গাটাই উড়িয়ে দেব। উপত্যকার ওপরে আমাদের লোকজন বোমা নিয়ে অপেক্ষা করছে। বরিস টেলিফোনে ওদের তৈরি হয়ে আসতে বলেছিল। ও-ও রয়েছে ওদের সঙ্গে।'

'বলেন কি!'

'হ্যাঁ, রিস্ক নেব না। আমি চাই না ভিজিলের ফর্মুলা কেউ হাত করুক।'

'কিন্তু ভিজিলের কথা কিছু ভেবেছেন? তাছাড়া কাউন্টেসের কাছেও তো একটা কপি আছে।'

'আছে, তবে থাকবে না। দুজনের কেউই পার পাবে না। কোমাচিন ওদের দায়িত্বে আছে।'

আমার কব্জি ব্যাণ্ডেজ করার জন্যে হাত বাড়াল রানা। চিরকালই বাঁ হাতটা কম চালু আমার। ফলে দেয়ার সময় পড়ে গেল রোলটা। ওটা মেঝেতে পড়ামাত্র উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল রানা। পরমুহূর্তে দেখতে পেলাম হাঁটু মুড়ে মেঝেতে বসে পড়েছে ও, খুলছে রোলটা। কারণটাও বুঝতে পারলাম। ব্যাণ্ডেজের রোল খুলতেই একতাড়া কাগজ বেরিয়ে এল। ছোট হস্তাক্ষরে বিজবিজে লেখা।

উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে রানা, চোখে দীপ্তি।

'পেয়েছি,' চেঁচাল ও, কাগজগুলো নাড়ছে আমার চোখের সামনে। 'ভিজিলের ফর্মুলার দ্বিতীয় কপি।'

পরমুহূর্তে আমার কাঁধ চেপে ধরে ঝাঁকাতে লাগল ও। তবে ওর আনন্দ স্থায়ী হলো না। কাশল কে যেন। বিশুদ্ধ ইংরেজিতে শুষ্ক কণ্ঠে বলল, 'আপনার ফুর্তি দেখে বড় ভাল লাগছে। তবে একটু বিরক্ত করব ; হাত দুটো যে মাথার ওপর তুলতে হয়।'

খাটো, বড় মাথাওয়ালা এক লোক দরজায় দাঁড়িয়ে চেয়ে রয়েছে আমাদের দিকে। বাঁকা হাসি ঠোঁটে। তার পেছনে রিভলভার হাতে ইগর আর ইউনিফর্ম পরা দুজন লোক।

তাদের পেছনে অবশ্য আরও লোকজন দেখা যাচ্ছে।

আমাদের চুপ করে থাকা ছাড়া গতি নেই। খাটো লোকটি ঢুকে এল ঘরে, বো করল রানাকে।

'আপনিই বোধহয় প্রফেসর সালাম। আমি ভিজিল। নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই?'

'না শুনে উপায় আছে?' মৃদু স্বরে বলল রানা।

আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ঘরের চারদিকটা জরিপ করল ভিজিল। পোড়া কাগজের স্তূপের দিকে স্বভাবতই দৃষ্টি গেছে ওর।

'ও বাবা, অনেক কাজ করেছেন তো,' শান্ত কণ্ঠে রানাকে উদ্দেশ্য করে বলল সে। ব্যাণ্ডেজের খোলা রোলের দিকে এ মুহূর্তে নজর ওর। 'বহুত আচ্ছা।' ব্যাণ্ডেজের ভেতর থেকে বেরনো কাগজগুলো মেঝে থেকে সযত্নে কুড়িয়ে নিল ও। তারপর ওগুলো পকেটে পুরে চলে গেল হাই ভোল্টেজ ল্যাবোরেটরীতে। ইগরের নিষ্প্রাণ চোখজোড়া আমাদের ওপর স্থির। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এল ভিজিল। ধক্‌ধক্‌ করে জ্বলছে দু চোখ। ইগরকে কি একটা বলে এগিয়ে গেল রানার দিকে। কষে এক চড় বসাল ওর গালে। নড়ল না রানা।

'এতবড় সাহস!' গর্জে উঠেছে ভিজিল। 'আমার কাগজপত্রগুলো তো পুড়িয়েছই, আমার অ্যাসিস্টেন্টকেও ছাড়োনি।'

'না, মঁসিয়ে,' শান্ত স্বরে বলল রানা। 'ও কাজটা

আমাদের নয়।'

ভিজিল ওর কথা বিশ্বাস করেছে বলে মনে হলো না।

বরিস এত দেরি করছে কেন? জানালার দিকে দৃষ্টি গেল আমার। আমার ভাবনাটা বোধহয় বুঝে ফেলেছে ভিজিল। বিদ্রূপের হাসি ফুটল ওর ঠোঁটের কোণে।

'বাকি বদমাশগুলোর কথা ভাবছ তো? ও আশা ছেড়ে দাও। ওদের সঙ্গে ভাগ্যক্রমে রাস্তাতেই দেখা হয়ে গিয়েছিল আমাদের।' ইগরের দিকে ফিরল ও। 'ওকে ভেতরে নিয়ে আসুন।'

চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল ইগর। দুজন সৈন্য ঢুকল ঘরে। দুপাশ থেকে বগলের দু দিক ধরে এক লোককে নিয়ে এসেছে। এই লোকটাই পালাতে পেরেছিল রবিন্সের সঙ্গে।

'ওকে সার্চ করুন,' আদেশ করল ভিজিল।

লোহার রডটা পাওয়া গেল। ভিজিল ওটা ইগরের হাতে দিতে বলল।

উভয় সঙ্কটে পড়েছি আমরা। এ লোকটার অপকীর্তির দায়ও কি আমাদের ওপর বর্তাবে নাকি? বরিস যেহেতু ধরা পড়েনি সেহেতু সামান্য হলেও রক্ষা পাওয়ার একটা আশা আছে। এ লোকটা যে আমাদের দলের নয় সেকথা মুখ ফুটে বললাম না আমরা। কিন্তু এ ব্যাটা ফস করে কিছু বলে বসবে না তো?

আমাদের তিনজনকে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে ফেলল ওরা।

কব্জিতে দড়ির ঘষা খেয়ে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে আমার। দাঁতে দাঁত চেপে সইতে লাগলাম।

'রডওয়ালা সবার আগে,' বলল ভিজিল।

আমার পাশের চেয়ারে বসা লোকটার দিকে এগোল ইগর। চেঁচাচ্ছে ও, বিকট স্বরে। রডটা তুলে সজোরে ওর কাঁধে বসিয়ে দিল ইগর। হাড় ভাঙার শব্দ। আর্তচিৎকার। ইগর আবার রড তুলেও ভিজিলের নির্দেশে নামিয়ে নিল।

'প্লীজ কর্নেল,' ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে ফ্রেঞ্চ ভাষায় বলল ভিজিল। 'অতখানি নিষ্ঠুর হবেন না। আমার মাথায় অন্য একটা বুদ্ধি এসেছে।'

ভিজিলের নির্দেশে হাই ভোল্টেজ ল্যাবোরেটরীতে তুলে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেয়া হলো আমাদের। মৃত অ্যাসিস্টেন্টটি মেঝেতে আমাদের পাশেই পড়ে রয়েছে। ল্যাবোরেটরীর অন্য প্রান্তে তখন ভিজিল, বড় একটা চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছে। চেয়ে দেখি দুটো তামার বল ছাদ থেকে ধীরে ধীরে নেমে আসছে।

'আপনার জন্যে পরিচিত পরিবেশ, প্রফেসর,' সহজ গলায় বলল ভিজিল। 'সময় নেই, নইলে আমার লেটেস্ট কাজ সম্পর্কে খানিক আলাপ করা যেত। তবে সে আনন্দ অন্যভাবে পুষিয়ে নেব আমি। বুঝবেন, বাঘের খাঁচায় ঢুকে কি ভুলটাই করেছেন। আপনাকে সাবধান করা হয়েছিল, কান দেননি। কাজেই বুদ্ধু বন্ধুগুলোকে নিয়ে মরা ছাড়া আর কোন উপায় নেই আপনার। বলে রাখি, মরবেন কিন্তু

হঠাৎই। এক মিলিয়ন ভোল্ট শরীরগুলো ছুঁয়ে দেবে কেবল। তখন বুঝবেন কোন্ পদ্ধতিতে মারা পড়লেন।' হা হা করে হাসল ভিজিল।

টান টান দেখাচ্ছে রানাকে, তবে টুঁ শব্দটিও করল না। আমিও ওর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলাম, যদিও ঘামে ভিজে যাচ্ছে সারা শরীর।

আমাদেরকে চেয়ারসুদ্ধ তুলে বসানো হয়েছে তামার বল দুটোর মধ্যখানে।

ভিজিল একটা সুইচের দিকে এগোল। হাত বাড়িয়েছে যেই অমনি বাইরে কিসের যেন শোরগোল শুরু হলো। ল্যাবোরেটরীতে ধেয়ে এল কাউন্টেস।

এক ঝলকে আমাদের দেখে নিয়ে চাইল ভিজিলের দিকে।

'শুনলাম সার্চলাইটটা নাকি ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যাপার কি?'

'ব্যাপার হচ্ছেন এই তিন ভদ্রলোক, ম্যাডাম,' জবাব দিল ভিজিল। 'ইগর আর আমি ল্যাবোরেটরীর ভেতরে পেয়েছি এদের। তল্লাশি করছিল। তাছাড়া এরা আমার অ্যাসিস্টেন্টকেও মেরে ফেলেছে। মিস্টার লিনফোর্ডের সম্মানে আমি এ তিনজনকে আমেরিকান আইন অর্থাৎ ইলেকট্রিসিটির মাধ্যমে মেরে ফেলব ঠিক করেছি।'

শীতল দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাইল কাউন্টেস। বুঝলাম, রাগে ফুঁসছে ভেতর ভেতর।

'আপনাদের দুজনকে সাবধান করেছিলাম। আমার কথা শোনার প্রয়োজন বোধ করেননি, এখন প্রায়শ্চিত্ত করুন।'

রাগে কাঁপছে মহিলা। লক্ষ্য করলাম নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে নিজের ওপর। অতি কষ্টে সামলে নিয়ে ফিরল ভিজিলের দিকে।

'কিছু হারিয়েছে?'

'না,' উত্তর এল। 'তবে কিছু কাগজপত্র পুড়িয়েছে এরা।'

'তবে এদের নিয়ে আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন।'

যাওয়ার জন্যে ফিরল সে। সুইচের কাছে আবার চলে গেছে ভিজিল। হঠাৎই ল্যাবোরেটরীর ডান দিকের দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল। তারপর একটানা গুলির শব্দ। দেখলাম ভিজিল আর অন্য তিনজন লোক মেঝেতে লুটিয়ে পড়েছে।

কাউন্টেসকে কভার দিয়ে দরজা দিয়ে পেছচ্ছে ইগর। সেই সঙ্গে পাল্টা গুলি চালাচ্ছে। উল্টো দিক থেকেও অবিরাম গুলি বর্ষিত হচ্ছে। ঘরের বাকি লোক দুজনও ঢলে পড়ল। ইগর অক্ষত অবস্থায় পালিয়েছে। এবার দৌড়ে ঘরে ঢুকে এল বরিস। তার পেছনে সশস্ত্র পাঁচজন বুনো চেহারার লোক। তাদের তিনজন ধাওয়া করল কাউন্টেস আর ইগরকে। বাকি দুজন দরজায় পাহারায় রইল।

আমাদের দড়িমুক্ত করল বরিস। রানা দ্রুত ভিজিলের কাছে পৌঁছল। মারা গেছে বিজ্ঞানী। চেয়ারের লোকটিরও একই দশা। মাথা ছ্যাঁদা করে দিয়েছে বুলেট।

বরিসের লোক তিনজন ফিরল এসময়। জানাল, কাউন্টেস আর ইগর গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেছে।

বরিসের কাছ থেকে ম্যাচ চেয়ে নিল রানা। ভিজিলের পকেট হাতড়ে কাগজগুলো বার করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। পুড়ে ছাই হয়ে গেল ভিজিলের মহামূল্যবান ফর্মুলা।

ক'মিনিট পরে আমি আর রানা পাহাড় বেয়ে রবিন্সের গাড়ির কাছে নেমে এলাম। আমাদের বেঁধে রাখা লোকটাকে দেখতে পেলাম না। বলাইবাহুল্য, রবিন্স তাকে ছুটিয়ে নিয়ে গেছে। খুলে নেয়া যন্ত্রাংশটা এঞ্জিনে আবার বসিয়ে দিল রানা। খুব সহজেই স্টার্ট নিল গাড়ি। উঠে বসলাম আমরা।

'এক মিনিট অপেক্ষা করতে হবে,' বলল রানা।

বৃষ্টি থেমেছে। আকাশ পরিষ্কার। বড্ড ঘুম পাচ্ছে আমার। তবে কব্জির ব্যথাটা ঘুম তাড়াতে যথেষ্ট সাহায্য করছে।

এখন বাজে পৌনে একটা। আর মাত্র পনেরো মিনিট। তারপরই শুরু হবে অভ্যুত্থান।

হঠাৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল আমাদের গাড়ি। ল্যাবোরেটরীর দিক থেকে অতি উজ্জ্বল আলো উঠে যাচ্ছে আকাশে। ধ্বংস হয়ে গেছে ভিজিলের সাধের ল্যাবোরেটরী।

'ভিজিল, তার ল্যাবোরেটরী আর ফর্মুলার একটা কপি খতম,' বিড়বিড় করতে শুনলাম রানাকে। 'এখন বাকি কেবল দ্বিতীয় কপিটা ধ্বংস করা।'

ষোলো

মে বাইশ

শহরে ঢোকার মুখে প্রথমবারের মত দেখতে পেলাম অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি। রাস্তায় ব্যারিকেড। ফলে থামতে হলো। ডিউটিরত সশস্ত্র লোকটিকে ছোট একটা কার্ড দেখাল রানা। উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল সে, আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। গাড়ি চলল শহরের দিকে।

শহর শান্ত। কোথাও কোন গোলযোগের চিহ্নমাত্র নেই। তবে আরও ভেতরে ঢুকতে দেখা গেল মেশিনগান হাতে ছোট ছোট দল, রাস্তার কোণে ছায়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কাউন্টেস যেখানে থাকে সেই স্কয়্যারের কাছে গাড়ি থামালাম আমরা। নেমে হাঁটতে শুরু করলাম। বাড়িটা আজও অন্ধকার, কেবল দোতলার একটিমাত্র ঘরে আলো জ্বলছে। কালো রঙের পেল্লায় একটা গাড়ি গেটের কাছে দাঁড়ানো।

কাজের লোকদের ঢোকার পথ দিয়ে ভেতরে চলে এলাম আমরা। দরজা খোলাই ছিল। রান্নাঘরে এসে ঢুকলাম। খাঁ-খাঁ করছে চারদিক। ম্যাচ জ্বালল রানা। বাড়ির পরিবেশ দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় লোকজন সব তড়িঘড়ি কেটে পড়েছে। ওপরতলায় মৃদু নড়াচড়ার শব্দ।

'মহিলা পালানোর জন্যে তৈরি হচ্ছে,' ফিসফিস করে বলল রানা।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করলাম। ঠাণ্ডা বোধ করছি। কব্জিটা টনটন করছে, খিদেও পেয়েছে। এ মুহূর্তে একটু ড্রিঙ্ক পেলে বড় ভাল হত। কিছুক্ষণের জন্যে সব চুপচাপ; তারপর হঠাৎ দড়াম করে খুলে গেল একটা দরজা। পায়ের শব্দ। সিঁড়ি বেয়ে নামছে কেউ। হলঘরের দরজাটা খুলেছে। চারদিক নিঃশব্দ।

হলঘরের দিকে এগোলাম আমরা। কোণের একটা ঘরে আলো জ্বলছে। এগোচ্ছে রানা, ওর পেছনে আমি। দরজার বাইরে থামলাম। ভেতরে কাগজ ওল্টানোর খসখস শব্দ। রানার হাতে পিস্তল এসে গেছে। আলতো করে সে ঠেলা দিল দরজায়।

কাউন্টেসের স্টাডিরুম এটা। তাকেও দেখতে পেলাম। ফারের কোট পরে সেফের পাশে দাঁড়ানো, হাতে এক গোছা কাগজ। ফায়ারপ্লেসে আরও একতাড়া কাগজ পুড়তে দেখে সে কি করছিল বুঝতে অসুবিধে হলো না। ঘাড় ফেরায়নি

সে।

'আসুন,' অন্যমনস্কভাবে বলল।

ঢুকলাম আমরা। রানার পিস্তল ওঠানো। তৈরি সে।

'আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম, প্রফেসর,' বলল মহিলা। বাকি কাগজগুলো ফায়ারপ্লেসে ফেলে দিয়েছে।

'এখানে কেন এসেছি জানেন নিশ্চয়ই?' শান্ত শোনাল রানার কণ্ঠ।

আমাদের দিকে ফিরল কাউন্টেস। মুখে হাসি।

'জানি, জানিই তো,' জবাব দিল সে। 'কিন্তু আপনার অনুরোধ রক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় যে।'

'আমাদের মানে?' ভ্রূ উঠে গেছে রানার।

'কর্নেল ইগর আপনার ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে আছেন।'

দমে গেলাম আমি। স্বেচ্ছায় ফাঁদে আটকা পড়েছি আমরা।

'পিস্তলটা নামিয়ে সামনের দিকে হাঁটতে থাকুন, তাহলে হয়তো দু'এক সেকেণ্ড বেশি বাঁচবেন,' ফরাসিতে বলল কাউন্টেস।

পিস্তল নামাল রানা। কেড়ে নেয়া হলো ওটা। ঘরে ঢুকে পড়েছে ইগর।

'পালানোর আগে আমার এক চাকর একটা মেসেজ রেখে গেছে,' সহজ গলায় বলছে কাউন্টেস, 'শহর বোধহয় এখন বিদ্রোহীদের আয়ত্তে।'

'ঠিকই শুনেছেন,' বলল রানা।

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রানার দিকে চাইল কাউন্টেস।

'আপনার এমন সব গুণ আছে যা একজন প্রফেসরের মধ্যে আশা করা যায় না। আপনাকে মাপতে ভুল হয়েছিল আমাদের। কর্নেল ইগর আপনার সম্পর্কে খুব আণ্ডার এস্টিমেট করেছিলেন। যাহোক, একটা ব্যাপার আমার কাছে আজও রহস্যময়। কার হয়ে কাজ করছেন আপনি, প্রফেসর?'

রানার দিকে চেয়ে দেখি শূন্য তার চোখের দৃষ্টি। জবাব শোনার জন্যে বৃথাই অপেক্ষা করল কাউন্টেস।

'থাক, বলতে হবে না,' শেষ পর্যন্ত বলল মহিলা। 'আচ্ছা, ল্যাবোরেটরী থেকে কি কি নিয়েছেন আপনি?'

'কিছুই না, ম্যাডাম। আর তাছাড়া ল্যাবোরেটরীটা এখন আর নেইও।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল কাউন্টেসের চেহারা।

'কেউ মারা পড়েছে?'

'বিস্ফোরণে কেউ বোধহয় মরেনি। কিন্তু কর্নেল ইগর যখন গুলি চালাচ্ছিলেন তখন ভিজিল নামে এক লোক পাল্টা গুলিতে মারা গেছে।'

দ্রুত শ্বাস টানতে শুনলাম কাউন্টেসকে। ইগরের চেহারায় কোন অভিব্যক্তি ফুটল না। তার পিস্তল ধরা হাতটা এক চুল নড়েনি। ঠাণ্ডা চোখ জোড়া আমাদের ওপর স্থির।

'তাই বলুন,' খানিক বাদে বলল কাউন্টেস। জানালার

কাছে হেঁটে-গেল সে। বাইরের অন্ধকারে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ফিরল আমাদের দিকে।

'আপনাদের মতলবটা কি ছিল?' জানতে চাইল মহিলা।

'ভিজিলের আবিষ্কারের ব্যবহার ঠেকানো এবং তার ফর্মুলা ধ্বংস করা। ব্যর্স।'

'কেন?'

'সভ্যতাকে রক্ষা করার জন্যে।'

অসহিষ্ণু কণ্ঠে খেঁকিয়ে উঠল কাউন্টেস।

'রাজনীতিবিদদের মত কথা বলছেন। ইক্সানিয়া ছোট দেশ। আমাদের টাকা নেই, সম্পদ নেই—কিছুই নেই। টিকে থাকার জন্যে চিরকাল কঠিন সংগ্রাম করতে হচ্ছে। আমাদের আর কোন উপায় ছিল না। ডু অর ডাই। অন্য দেশ দখল করতে না পারলে না খেয়ে মরতে হবে আমাদের। সে সুযোগও এসেছিল। কিন্তু আপনার জন্যে কিছুই হলো না। এসব কিছুর জন্যে আপনিই দায়ী।'

'চাইলেই আপনারা দেশের উন্নতি করতে পারতেন,' জবাবে বলল রানা। 'কিন্তু করেননি। জনগণের সরকার অবশ্যই দেশের জন্যে কাজ করবে। ভুল হয়তো হবে তাদের। তবে তারা এটুকু জানে, যুদ্ধ কেবল মৃত্যুই ডেকে আনে; কোন সুফল তাতে আসে না।'

অধৈর্য কাউন্টেস হাত ওঠাল।

'অন্য পরিবেশে এ আলোচনায় হয়তো আগ্রহী হতাম

আমি। কিন্তু এখন আমাদের হাতে সময় নেই। এখুনি চলে যেতে হবে। কর্নেল আপনাদের খুন করার জন্যে এক পায়ে খাড়া। আপনাদের ব্যাপারে আমারও আর কিছু বলবার নেই।'

আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার সময় তাকে ঠেকাল রানা।

'মরার আগে,' শান্ত স্বরে বলল ও। 'একটা অনুরোধ করছি।'

'কি অনুরোধ, মঁসিয়ে?' তাড়া আছে কাউন্টেসের।

'আমাদের সামনে ভিজিলের ফর্মুলার কপিটা পুড়িয়ে ফেলুন।' প্লীজ, ম্যাডাম,' জরুরী কণ্ঠে বলে চলেছে রানা, 'আর্মড লোকজন বাড়িটাকে ঘিরে রেখেছে। কোমাচিনের পারমিশন ছাড়া জোভোগোরোড ছেড়ে কেউই বেরতে পারবে না, আগামী বারো ঘণ্টার জন্যে।'

'ইনফর্মেশনটার জন্যে ধন্যবাদ, মঁসিয়ে। কিন্তু একদল গর্দভ ওয়ার্কারের জন্যে তো আর প্ল্যান পাল্টাতে পারি না। আর ভিজিলের ফর্মুলা সঙ্গে নিয়ে তবেই যাব আমি, কেউ ঠেকাতে পারবে না। আপনারা জেসন ভিজিলকে খুন করেছেন। তাঁর মত গুণী লোক আর জন্মাবেন কিনা সন্দেহ। উনি নেই কিন্তু ওঁর কীর্তি চিরকাল রয়ে যাবে।'

কাউন্টেস যখন কথা বলছে তখন খুব আলগোছে বাঁয়ে সরে গেছে রানা। কাউন্টেস এখন ইগর আর রানার মধ্যখানে

দাঁড়ানো। ইগর গুলি চালালে কাউন্টেসের গায়ে লেগে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। দেখতে পাচ্ছি ইগরও আমাদের কভার করার জন্যে এক কোণে সামান্য সরে গেছে। রানা ভান করল কাউন্টেসের কথার জবাব দিচ্ছে, হঠাৎই দেখলাম তড়িৎ গতিতে ঝুঁকে ইগরের পা লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়েছে সে।

ইগরের গুলি ছাদে গিয়ে বিঁধল। ওদিকে মাটিতে জড়াজড়ি করে পড়ে রয়েছে রানা আর ইগর। ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম আমি, কি করা উচিত ভেবে পাচ্ছি না। পেছনে নড়াচড়ার শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি কাউন্টেস। আমি তার দিকে এগোতেই সুইচ টিপে বাতি নিভিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। আমি দরজার হাতলে হাত রাখতেই ক্লিক করে শব্দ হলো। লক করে দিয়েছে। সুইচ খুঁজে পেয়ে বাতি জ্বাললাম। পরমুহূর্তেই পরপর দুটো গুলির শব্দ। ইগরকে হঠাৎ দেখে পাথরের মূর্তির মত মনে হলো। কাশতে শুরু করল সে, দড়াম করে মেঝেতে পড়ে গেল।

দ্রুত শ্বাস টানছে রানা। ইগরের পিস্তলটা এখন ওর হাতে।

'কাউন্টেস কই গেল?' কোনমতে প্রশ্ন করল ও।

'পালিয়েছে, দরজা লক করে।'

পকেটে পিস্তল ঢুকিয়ে জানালার কাছে গেল রানা। খুলেছে।

'আসুন,' বলল ও, 'কাউন্টেসকে কিছুতেই ওই কপি নিয়ে পালাতে দেব না।'

রবিন্সের গাড়ির কাছে যখন পৌঁছলাম তখন রীতিমত বেহাল আমি। রানার পাশের সীটে বসার পর জানে যেন পানি ফিরে পেলাম। খবর নেব বলে একটুক্ষণের জন্যে প্রথম ব্যারিকেডের সামনে থামতে হলো। কাউন্টেস ব্যারিকেড মানেনি। তার কালো মার্সিডিজ সোজা চালিয়ে দিয়েছে। ফলে দুজন লোক আহত হয়েছে।

রানার অনুমান মহিলা সাউথ-ইস্ট রোড ধরে সীমান্তের দিকে পালাচ্ছে। পাহাড়ী একটা গ্রামের ভেতর দিয়ে গেছে রাস্তাটা।

'বৃষ্টিতে বোধহয় জায়গায় জায়গায় ধস নেমেছে,' বলল রানা। 'তবে ঝুঁকি তাকে নিতেই হবে। এটাও ঠিক ও আমাদের চেয়ে বেশ খানিকটা পথ এগিয়ে রয়েছে। এখন আল্লাহ আল্লাহ করে আমার আন্দাজটা ঠিক হলেই হয়।'

প্রচণ্ড গতিতে শহর পেরোলাম। গাড়িটা চমৎকার কণ্ডিশনে রয়েছে। রানা চালাচ্ছেও রেসিং ড্রাইভারদের মত। সাউথ-ইস্ট রোডের ব্যারিকেডের কাছাকাছি পৌঁছে হেডলাইটের আলোয় বুঝতে পারলাম ঠিক পথেই চলেছি। এখানেও ব্যারিকেড ভাঙা হয়েছে। লোকেরা আবার যথাস্থানে ব্যারিকেড বসাচ্ছে। রানা স্পীড কমিয়ে হেডলাইট বার পাঁচেক ফ্ল্যাশ করল। আমরা ব্যারিকেড পেরনোর সময়

লোকজন উত্তেজিতভাবে সামনের দিকে আঙুল দেখাল। আবার স্পীড তুলল রানা।

রাস্তা এতক্ষণ মোটামুটি ভালই ছিল। কিন্তু ওপরে উঠতে শুরু করতেই ঝামেলা শুরু হলো। কাদাপানিতে চাকা পিছলে যায়, ঘুরতে থাকে। সামনে এগোনো খুবই মুশকিল, হেডলাইটের আলো যথেষ্ট নয়। তবে এ অবস্থা বেশিক্ষণ রইল না, বিজলী চমকাতে শুরু করেছে। কাউন্টেসের টিকিটিও দেখতে পাচ্ছি না।

এবার কাদার জায়গা নিল পাথর। রানা স্পীড বাড়াতেই পাগলের মত ঝাঁকি খেতে শুরু করল গাড়ি। উঠছি আমরা। বিপজ্জনক বাঁক, দু দিকে খাদ। পাহাড় চূড়ায় পৌঁছে গেলাম শেষ পর্যন্ত। ঘন ধোঁয়ার মেঘ তৈরি করছে গাড়ির এঞ্জিন। ঢাল বেয়ে অর্ধেক পথ নেমে আসার পর মার্সিডিজটার দেখা পেলাম। পরের পাহাড়টায় উঠছে।

'এ হারে চালাতে পারলে ও ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই সীমান্ত ক্রস করবে,' বলল রানা।

উঠছে আমাদের গাড়ি। মার্সিডিজের লাইটগুলো এ মুহূর্তে অদৃশ্য। পাগল হয়ে গেছে যেন রানা। এক্সিলারেটরে বাড়ছেই পায়ের চাপ। দরজার ভেতর দিককার হাতল শক্ত করে চেপে ধরে বসে রয়েছি আমি। অনুমানে বুঝলাম আমরা এখন মার্সিডিজের চেয়ে মিনিট তিনেকের পথ পিছিয়ে রয়েছি। রাস্তা এখানে ভালই, যদিও ছোট আকারের প্রচুর

পাথর বিছিয়ে রয়েছে রাস্তাময়।

আকাশ গোমড়ামুখো। যে-কোন মুহূর্তে প্রবল বর্ষণ শুরু হয়ে যেতে পারে। সামনের তুষার ঢাকা বিশাল চূড়া দুটোর মধ্যখান দিয়ে একটা গভীর গিরিপথ চলে গেছে। পাহাড়ের পাশ দিয়ে সাপের মত এঁকেবেঁকে নেমে গেছে রাস্তা, মার্সিডিজটা এখন অনেকখানি নিচে। নামতে শুরু করেছি আমরাও। ঢাল বেয়ে নামার সময় স্পীড কমাচ্ছে না রানা। কড়া ব্রেক কষছে প্রতিটা বাঁকে। একবার তো প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম খাদে। কোনমতে গাড়িটাকে রাস্তায় রাখতে সক্ষম হলো-রানা। একটু পরেই কাউন্টেসের দুটো বাঁক পেছনে চলে এলাম আমরা। মহিলা রানার চেয়ে কম ঝুঁকি নিচ্ছে, ফলে অ্যাডভান্টেজ ধরে রাখতে পারেনি। সামনের গাড়িটার এঞ্জিনের গর্জন এখন পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি।

আমাদের দেখে অথবা গাড়ির আওয়াজ শুনে স্পীড বাড়িয়ে দিয়েছে কাউন্টেস। রানাও একই কাজ করল। কাউন্টেসের গাড়ি যদি সামনের শুকনো রাস্তায় একবার উঠতে পারে তবে তাকে ধরা আর আমাদের কম্ম নয়। মার্সিডিজের সঙ্গে পাল্লা দেয়ার ক্ষমতা নেই রবিন্সের গাড়ির। প্রচণ্ড গতিতে যখন শেষ বাঁকটার উদ্দেশে ছুটছি তখন দেখলাম রানার হাতে এসে গেছে ইগরের পিস্তল। লোকটার এলেম আছে বটে। মনে মনে প্রশংসা না করে পারলাম না।

'ও বাঁক ঘুরলেই.' কঠিন শোনাল রানার গলা, 'পেছনের

টায়ার দুটো ফাটিয়ে দেব। ওকে মারার ইচ্ছে ছিল না আমার। কিন্তু কোন উপায় নেই বোধহয়।'

শেষ বাঁকটার দিকে ধেয়ে যাচ্ছে গাড়ি দুটো। প্রচণ্ড শব্দে ব্রেক কষল কাউন্টেস। রানাও শক্ত ব্রেক চেপেছে। বাঁকের অর্ধেকখানি ঘুরতেই গাড়ির ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারাল কাউন্টেস ক্যারেনিনা। পেছনের চাকা দুটো মুহূর্তে রাস্তার ওপাশে চলে গেল। কয়েক সেকেণ্ড পরেই সশব্দে পতিত হলো মার্সিডিজ।

বাঁক ঘোরার আগেই গাড়ি থামালাম আমরা। নিচে যখন নেমে এলাম তখন জ্বলছে মার্সিডিজ। প্রচণ্ড উত্তাপ চারপাশে। তবে গাড়ির ভেতরে কাউন্টেসকে দেখতে পেলাম না। তাকে পাওয়া গেল খানিকটা দূরে।

হাঁটু গেড়ে তার পাশে বসে পড়ে মাথাটা তুলে ধরল রানা।

জ্বলন্ত গাড়ির আলোয় অদ্ভুত দেখাচ্ছে কাউন্টেসের সুন্দর মুখটা। খুব সম্ভব নিচে পড়ামাত্রই মৃত্যু হয়েছে তার। কাউন্টেসের কোটের পকেট থেকে এক গোছা কাগজ ধীরে ধীরে বার করে আনল রানা। ওগুলো এগিয়ে দিল আমার দিকে।

'এগুলো পুড়িয়ে ফেলুন, লিনফোর্ড,' কাঁপা গলায় বলল ও।

কাগজগুলো নিয়ে জ্বলন্ত গাড়ির দিকে এগোলাম । হঠাৎ

কি মনে হতে পেছন ফিরে চেয়ে দেখি ইগরের পিস্তলটা নিজের কপালে ঠেকাচ্ছে রানা। তখনও সে বসে রয়েছে হাঁটু গেড়ে। এক ছুটে ফিরে এলাম। পিস্তলটা ওর হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিলাম দূরে।

আমার দিকে এক ঝলক চাইল ও। গাল দুটো চিকচিক করছে পানিতে, ঠোঁট কামড়ে ধরেছে। কাগজগুলো ওর হাতে দিলাম। শূন্য দৃষ্টিতে ধরে থাকা কাগজগুলোর দিকে সে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ।

'আপনিই বরং পোড়ান,' বললাম আমি।

অনিশ্চিত পদক্ষেপে গাড়িটার দিকে এগোল ও, ঝুলে পড়েছে কাঁধ। আগুনে নিক্ষিপ্ত হলো মহামূল্যবান কাগজ। ওগুলো পুড়ল কিনা দেখার জন্যে দাঁড়াল না ও। উঠে যাচ্ছে রাস্তার দিকে। আগুনের শিখায় দেখে ওকে এই প্রথমবারের মত একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ বলে মনে হলো আমার।

গাড়িতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি। ঘুম ভাঙতে দেখি জোভোগোরোডের ঠিক বাইরে ব্যারিকেডের সামনে আমাদের গাড়ি দাঁড়ানো। তখনও সূর্য ওঠেনি। ম্লান আলোয় রানাকে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। শহরের ভেতর থেকে মেশিন গানের গুলির শব্দ আসছে।

অভ্যুত্থান সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। কোমাচিনের দল ক্ষমতা দখল করেছে। গুটি কয়েক সৈন্য বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিল

বটে তবে সফল হয়নি।

আমাদের গাড়ি শহরে প্রবেশ করল। হোটেলের কাছে আমাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল রানা। সোজা নিজের রুমে চলে এলাম আমি। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর। পরবর্তী আট ঘণ্টা একটানা ঘুমালাম।

সতেরো

মে ব্রাইশ

ঘুম যখন ভাঙল তখন দেশের শাসনভার কোমাচিনের হাতে। সে অবশ্য ঘোষণা দিয়েছে, ভোট হবে। জনগণ যাকে বেছে নেবে সে-ই চালাবে দেশ। মেজাজ খিঁচড়ে গেল আমার। ঘুমিয়ে এই ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো থেকে বঞ্চিত হলাম, সাক্ষী থাকতে পারলাম না।

বেল বাজাতেই হাজির হয়ে গেল মাইকেল। মুখে চওড়া হাসি, হাতে ট্রে।

খানিক বাদে এল রানা। ক্লান্ত দেখাচ্ছে তাকে। গোসল করতে ঢুকল ও। গোসল আর শেভ সেরে যখন বেরোল তখন সামান্য সতেজ দেখাল ওকে।

পরে গভর্নমেন্ট হাউজ-এ আমাদের স্বাগতম জানাল কোমাচিন। আমাকে নতুন সরকারের অফিশিয়াল প্রেস অফিসারের দায়িত্ব দেয়া হলো। আমেরিকার সরকার স্বীকৃতি

জানিয়েছে। আর আমার কাগজ ছ মাসের জন্যে ইক্সানিয়ার সরকারকে ধার দিয়েছে আমাকে।

কোমাচিনের প্রথম চিন্তা টাকার জোগাড় করা। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজেদের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই কেবল দ্রুত বৈদেশিক ঋণ পাওয়া সম্ভব। যা এ মুহূর্তে বিশেষ প্রয়োজন। সেজন্যেই আমার সাহায্য চায় ও।

পরের কদিন বেরোতে পারলাম না বড় একটা। গভর্নমেন্ট হাউজে জনা কয়েক সহকারীকে নিয়ে কাজ করে গেলাম। আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থাগুলোয় কোমাচিন সরকারের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার প্রশংসা করে প্রচুর লেখালেখি করলাম।

এরমধ্যে রানা একদিন এল আমার অফিসে। অসুস্থ দেখাচ্ছে, সেকথা তাকে বললামও। বিড়বিড় করে ওকে বলতে শুনলাম, 'ভালই তো আছি।' বুঝলাম, কিছু একটা নিয়ে দুশ্চিন্তামগ্ন সে। কথা বলার সময় আমার চোখে চাইছে না।

'আজ রাতে প্যারিস যাচ্ছি।'

বিস্মিত হলেও চুপ করে রইলাম।

'জানেনই তো,' বলল ও, 'আমার এখানকার কাজ খতম। আর কিছু করার নেই।'

উঠে দাঁড়াল ও, দেখে মনে হচ্ছে পা দুটো ওর শরীরের ভার বইতে পারছে না। 'রাতের ট্রেনে চলে যাচ্ছি।'

ওর কাঁধে হাত রাখলাম।

'শুনুন, রানা,' বললাম, 'আপনি অসুস্থ। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করুন না, বিশ্রাম নিন। কোন তাড়া তো নেই। আপনি সরকারের লোক। তারা আপনাকে সব রকম সাহায্য করবে, খাতির যত্ন করবে।'

'আপনি ভুলে যাচ্ছেন,' ক্লান্ত গলায় বলল ও, 'আমি প্রফেসর সালাম নই। আজ না হয় কাল ওরা জানবেই।'

'জানুক, তাতে কি?' বললাম, 'কাল বরিস আমাকে জিজ্ঞেস করছিল আপনার আসল পরিচয় কোন্‌টা। ওদের ধারণা, আপনি রাশিয়ার চর। হয়তো ওদের ধারণাই ঠিক। সত্যি কথাটা আমাকে জানাতে আপত্তি আছে?'

জবাব দিতে গিয়েও যেন সামলে নিল ও। বন্য চাহনি ওর চোখে। চাইছে না আমার দিকে।

'জেনে কি লাভ?' বিড়বিড় করল ও, 'আমার কাজ তো শেষ।'

ওকে থামানোর আগেই বেরিয়ে গেল।

সে রাতে নটার সময় আমি তখন জোভোগোরোড স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। রানা যে আসলে কে সেটা জানার জন্যে তীব্র কৌতূহল অনুভব করছি। হর্ন দিচ্ছে, ট্রেন ছেড়ে দেবে। রানা এখনও পৌঁছেনি।

ট্রেন চলতে শুরু করল। একটু পরেই মিশে গেল অন্ধকারে।

হোটেলে ফিরে দেখি আমার জন্যে একটা নোট লিখে

রেখে গেছে রানা। ওতে লেখাঃ

'প্রিয় লিনফোর্ড,

বিদায়ের সময় দেখা করতে পারলাম না বলে কিছু মনে করবেন না। বুঝতে পারছি আপনি আমার ব্যাপারে খুব কৌতূহল বোধ করছেন। তা তো করবেনই, হাজার হলেও আপনি রিপোর্টার, সংবাদপত্রের লোক। বিকেলের ট্রেনে চলে যাচ্ছি। আমার জন্যে ভাববেন না। গুডবাই, বন্ধু, আর কোনদিন হয়তো দেখা না-ও হতে পারে। প্রয়োজনের সময় বন্ধু হিসেবে পেয়েছি আপনাকে, সেজন্যে আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।

শুভেচ্ছা—

মাসুদ রানা।'

মাসুদ রানা নামের মানুষটি সম্বন্ধে এরপর আর কোন কিছুই জানতে পারিনি। দুদিন পরে জানলাম বিখ্যাত বিজ্ঞানী প্রফেসর সালামের ওপর বেল-প্যারিস এক্সপ্রেসে হামলা হয়েছে।

আঠারো

অক্টোবর

সেপ্টেম্বর নাগাদ কোমাচিনের সরকার লণ্ডন, প্যারিস এবং নিউ ইয়র্কের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সাহায্য সহযোগিতা পেয়ে গেল। ফলে আমার প্রয়োজনও ফুরিয়ে এল। অক্টোবরের গোড়ার দিকে প্যারিসে নিজের চাকরিতে ফিরে গেলাম আমি।

প্যারিসে ফিরেই গত ক মাসের ফরাসি কাগজগুলো খুলে বসলাম। বেল-প্যারিস এক্সপ্রেসের ঘটনাটি সম্পর্কে এরা কি লিখেছে জানতে হবে। হতাশ হতে হলো আমাকে। কাগজে বিশেষ কিছুই লেখেনি। শুধু জানতে পারলাম প্রফেসর সালামকে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। মাথায় গুরুতর আঘাত দেখে অনুমান করা হয় কোন চোরের কীর্তি সেটা। তবে চোরটি নির্বিঘ্নে তার কাজ সারতে পারেনি। কারণ, প্রফেসরের পকেট থেকে একটি ফুটো পয়সাও খোয়া যায়নি।

কোন পত্রিকাতেই এ ঘটনার পাঁচ সপ্তাহ আগে প্রফেসর সালামের ইংল্যাণ্ড থেকে নিখোঁজ হওয়ার কোন খবর পরিবেশন করা হয়নি।

দু'দিন পরে ট্রেনের ইন্সপেক্টরের সঙ্গে দেখা করলাম। নিজের মনে তৈরি করা থিয়োরিটা একটু যাচাই করবার জন্যে আকুলি বিকুলি করছিলাম আমি। ইন্সপেক্টরের কাছে জানতে চাইলাম ইংলিশ পাসপোর্টধারী আর কেউ সেই কামরায় ছিল কিনা। ছিল। ইন্সপেক্টর নিজেই কথা বলেছিলেন তার সঙ্গে।

'লোকটা দেখতে কেমন মনে আছে?' জিজ্ঞেস্ করলাম।

মাথা চুলকালেন ভদ্রলোক। বহু দিন আগের কথা, অন্তত তাঁর কাছে তো বটেই।

রবিন্সের বর্ণনা দিতেই চিনতে পারলেন তিনি। তবে নামটা মনে করতে পারলেন না কিছুতেই। আমার আর বিশেষ কিছু জানার নেই। আমার অনুমান সঠিক।

রবিন্সের নিশ্চিত ধারণা ছিল রানা ভিজিলের ফর্মুলা তার কাছে রেখে দিয়েছে। ফলে ওটা হাতানোর জন্যে বেপরোয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করেছিল সে।

সপ্তাহ দুয়েক পরে পত্রিকার কাজে লণ্ডনে যাওয়ার দরকার পড়ল। ওখানে পৌঁছে প্রফেসর সালামের খোঁজ খবরও নিলাম। জানতে পারলাম ব্রাইটনের ছোট্ট একটা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। পরের ট্রেনেই রওনা দিলাম ব্রাইটন।

নার্স ভদ্রলোক বিনয়ী হলেও কর্তব্যপরায়ণ। প্রফেসরের সঙ্গে দেখা করার কোন সুযোগই দিতে রাজি হলেন না। হেড ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। আমার উদ্দেশ্য শুনে সন্দিহান হতে দেখলাম তাঁকে।

'আপনার এত দেখা করার কি প্রয়োজন?' সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'আপনি কি ওঁর আত্মীয়?'

গল্প তৈরিই রেখেছিলাম।

'না। তবে প্রফেসরের রহস্যজনকভাবে লাপাত্তা হওয়ার কথা কাগজে পড়েছি, ওঁর ছবিও দেখেছি। আমার ধারণা, আমি ওঁকে চিনি। ছবি দেখে মনে হলো জুরিখে মে মাসে যাঁকে দেখেছিলাম ইনিই তিনি।'

সন্তুষ্ট মনে হলো ডাক্তারকে। জানালেন, প্রফেসরের 'সাম্প্রতিক দুর্ভাগ্যজনক অসুস্থতার' কারণ খুঁজে বার করার জন্যে খুব সিরিয়াস তাঁরা।

'ওঁকে ডিস্টার্ব করা চলবে না,' বললেন ডাক্তার। 'একদম চুপ করে থাকবেন।'

হাসপাতালের পেছন দিকের একটা ঘরে উনি নিয়ে এলেন আমাকে। নিঃশব্দে দরজাটা লাগালেন। পড়ন্ত বিকেল, ঘরে শরতের ডুবন্ত সূর্যের ম্লান আলো।

বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে রয়েছেন ভদ্রলোক। তাঁর মাথার ধূসর হয়ে আসা চুলগুলো দেখা যাচ্ছে। লম্বা আঙুলগুলোর দিকে চাইলাম। বহুবার পাইপে তামাক ভরতে দেখেছি ওই

আঙুলগুলোকে। মনটা চলে গেল অতীতে। ওই আঙুলগুলোই পিস্তল ঠেকিয়ে ছিল তাঁর নিজেরই কপালে।

ঘুমন্ত মানুষটি কেশে উঠে পাশ ফিরলেন।

'ইনিই নাকি?' বাইরে বেরিয়ে আসার পর জানতে চাইলেন ডাক্তার।

মাথা নাড়লাম।

'না, ইনি অন্য লোক।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডাক্তার।

'অদ্ভুত কেস,' বললেন তিনি। বিনাবাক্যব্যয়ে সায় জানালাম।

স্টেশনের দিকে যখন ফিরছি তখন রাস্তা প্রায় ফাঁকা। লোকজন নেই বললেই চলে। সূর্য ডুবে যাচ্ছে। সমুদ্রের দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। ওভারকোটের কলার তুলে দিলাম। বড্ড শীত।

একখণ্ডে সমাপ্ত স্পাই থ্রিলার

প্রফেসর মাসুদ রানা

কাজী শাহনূর হোসেন

ইউরোপের ছোট্ট একটা দেশ যদি সুপার নিউক্লিয়ার
বোমা বানিয়ে ফেলে তবে কি ঘটবে?
যে করে হোক
ঠেকাতে হবে ভিজিলের বোমা তৈরির পরিকল্পনা,
ধ্বংস করতে হবে তার ফর্মুলার সব কটা কপি।
কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে?
নিজের জীবন বাজি রেখে শত্রুশিবিরে
হানা দেয়ার ক্ষমতা কার আছে? মাসুদ রানার?
ও কি পারবে মানব জাতিকে নিশ্চিত
ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০